ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীজীবনঃ অন্যতর ভাবনা

*অনুপম হাসান

Abstract: Almost all of the women presented in Rabindranath Tagore's novel are victims of gender discrimination. pointless to say, they are basically ordinary women who follow the established and traditional ideals of Bengali society. Rabindranath made some of the women in his novels so tactfully that it is perplexing to review the above; It seems that they are protestant, rebellious or independent against traditional society and masculinity. Upon closer assessment it appears that these [female characters] have been portrayed as subordinate to the traditional masculine society and inferior to the male-dominated mentality. He consciously accepted women as subordinate and minor to the feminist society. She could not accept the freedom of women and society or their humanitarian aspirations. Neither Mrinal nor Chandra were discovered in Rabindranath's short story as a rebellious woman. Rather, some of the women of the novel behave as mighty once, but in the end they surrender themselves to the softness and loyalty of the weak women of usual Bengali society. In the novel, Rabindranath has given women as much freedom as there is the possibility of masculinity if minimum freedom is not given. Rabindranath's women are housewives, their lives are restricted to traditional secular circles. Rabindranath did not accept the freedom and social dignity of modern feminists for women. He wanted to establish them as Kalyaniya in the house, reminding them of the natural physical limitations of women.

শুরুর কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১] কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন। তিনি একাধারে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ এবং গান রচনার পাশাপাশি গানের স্বরলিপিও তৈরি করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনেও যে তাঁর পদচারণা দৃপ্ত ও দৃঢ় ছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি প্রথম যৌবনে উপন্যাস রচনায় হাত দিলেও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সাফল্য অর্জিত হয় বিশ শতকের শুরুর দিকে 'চোখের বালি' [১৯০৩] প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র মতো প্রথম শ্রেণির উপন্যাস রচনার তিন বছর পর কিভাবে এবং কেন 'নৌকাডুবি'র [১৯০৬] মতো একটি ব্যর্থ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেছিলেন তা বোধগম্য হয় না। প্রসঙ্গত একথাও সত্য যে, মানবজীবনে ব্যক্তির চিন্তাচেতনার বিকাশ সবসময় ধারাবাহিক বা ক্রমোন্নয়নমুখি নিয়ম মেনে চলবে সেকথা হলফ করে বলা যায় না।[১] এসব কথা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী।

করা যেতে পারে তবে সমাধানে উপনীত হওয়া যায় না সহজে বা সেটা সহজসাধ্য ব্যাপারও নয়। এসব বিতর্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে[২] বিধৃত নারী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে বাঙালি নারীসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মানসচেতনায় যে লিঙ্গবৈষম্যমূলক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা এখানে যৌক্তিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব উপন্যাসই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও নির্দিষ্টভাবে এগুলোর তালিকা নিচে দেয়া হলো:

ক্রমিক	উপন্যাসের নাম	প্রকাশকাল	নারী-চরিত্র
১.	বৌঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩	[গুরুত্বপূর্ণ নারী-চরিত্র নেই]
২.	রাজর্ষি	১৮৮৭	[গুরুত্বপূর্ণ নারী-চরিত্র নেই]
৩.	চোখের বালি	১৯০৩	বিনোদিনী, আশালতা
৪.	নৌকাডুবি	১৯০৬	হেমনলিনী, কমলা
৫.	গোরা	১৯০৯	সুচরিতা, ললিতা
৬.	ঘরে-বাইরে	১৯১৬	বিমলা
৭.	চতুরঙ্গ	১৯১৬	দামিনী
৮.	যোগাযোগ	১৯২৯	কুমুদিনী
৯.	শেষের কবিতা	১৯৩০	লাবণ্য
১০.	মালঞ্চ	১৯৩৪	নীরজা
১১.	চার অধ্যায়	১৯৩৪	এলালতা

উদ্ধৃত তালিকায় উপন্যাস প্রকাশের সাল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ২২ বছরের তরুণ, তখন প্রথম উপন্যাস *বৌঠাকুরাণীর হাট* [১৮৮৩] প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ বছর পরে যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৭ বছর, তখন তিনি রচনা করেন *রাজর্ষি* [১৮৮৭]; এটি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস।[৩] প্রথম যৌবনে রচিত রবীন্দ্রনাথের *বৌঠাকুরাণীর হাট* ও *রাজর্ষি*' উপন্যাস দুটোতে তাঁর পূর্ববর্তী শক্তিমান লেখক ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৩৮-'৯৪] প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম যৌবনের উপন্যাস দুটোতে খুব একটা আলাদা করে চেনারও সেই অর্থে সুযোগ নেই। তাঁর এ দুটো উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের বুঁনোন থেকে শুরু করে ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। এজন্য মনে করা হয়, *বৌঠাকুরাণীর হাট* এবং *রাজর্ষি* রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করলেও প্রকারন্তরে তিনি তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেননি। তাছাড়া গতানুগতিক ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে রচিত উপন্যাস দুটো শিল্প-বিচারের মানদণ্ডেও সফল হয়নি। কারণ হিসেবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের যেহেতু বিশেষ ঝোঁক ছিল কবিতা রচনার দিকে, সেজন্য তাঁর প্রথম যৌবনে রচিত উপন্যাস দুটোর বর্ণনায় লিরিকাচ্ছন্নতার পাশাপাশি প্রতিবেশ পৃথিবীর বাহ্যজীবন নিরেট-নির্মোহ বাস্তবতার পরিবর্তে গল্পের কাহিনি আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসালোচনায় সাধারণত *বৌঠাকুরাণীর হাট* ও *রাজর্ষি*'র কথা প্রায়শ উহ্য থাকে। শিল্পের মানদণ্ডে উঁচু মানের না হলেও রবীন্দ্রনাথের এ উপন্যাস দুটোর অস্তিত্বও কিন্তু অস্বীকার

করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক কারণেই উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নামের সাথে যুক্ত হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় রবীন্দ্রপ্রতিভার নিজস্বতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের বালি [১৯০৩] প্রকাশের মধ্য দিয়ে।[৪] *চোখের বালি* রচনার পর রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান লেখকের নিকট থেকে 'নৌকাডুবি'র মতো একটি ব্যর্থ কল্পকাহিনীমূলক উপন্যাস আশা করা যায় না। এ উপন্যাসটি *চোখের বালি*'র সমকক্ষ হওয়া তো দূরে থাক *নৌকাডুবি* সম্বন্ধে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন শিল্পমান সম্মত হয়ে ওঠেনি।[৫] এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা মূলত *চোখের বালি* রচনার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথম যৌবনে তাঁর ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে রচিত উপন্যাস[৬] দুটো ছাড়া আমাদের আলোচনায় তাঁর অবশিষ্ট উপন্যাসগুলোতে বিধৃত বৈষম্যমূলক নারী-জীবনের স্বরূপ রবীন্দ্রমানসে প্রতিফলিত হয়েছে, তা যথাসাধ্য যুক্তি পরম্পরায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *চোখের বালি* [১৯০৩] উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা ক্রমপরিণতির মাধ্যমে *শেষের কবিতা*'য় [১৯৩০] লাবণ্য চরিত্রে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রায় তিন দশকব্যাপী রচিত রবীন্দ্রোপন্যাসে নারী-জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বাঙালি নারীসমাজ ও তাদের জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্র-মানসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেসব নারী-চরিত্র বিশেষত নায়িকার জীবনচিত্র পাওয়া যায়, তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বাস্তবতায় কিভাবে দেখেছেন কিংবা তাদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ও চিন্তাদর্শের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা দরকার।

কবি রবীন্দ্রনাথ এবং ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে একজন হওয়া সত্ত্বেও শিল্পের উভয় শাখায় রবীন্দ্রনাথের সমান ও সমান্তরাল আদর্শ ও মানসচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা সন্দেহাতীতভাবে বলার সুযোগ নেই। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীকে কাব্যলক্ষ্মী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবতাবর্জিত অধ্যাত্মলোকে গড়ে তুলেছেন নারীর রোমান্টিক কল্পমূর্তি। কবিতায় কল্পনার অবাধ প্রসার বা বিস্তারের সুযোগ থাকলেও কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে এবং এখানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ সেই অর্থে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে কল্পলোকের বাইরে বেরিয়ে এসে বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিকতায় নারীকে ঠিক কাব্যলক্ষ্মী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি; বরং নারীর প্রতি তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে পুরুষতান্ত্রিক স্বভাবসুলভ বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও উপন্যাসে নারী-জীবনের স্বরূপ এক নয়; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও ভিন্নতর। আলোচনার শুরুতেই প্রাসঙ্গিক সূত্রে বাঙালি নারীসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে তুলে ধরা দরকার। কেননা, তিনি উপন্যাসে নারী-জীবন অঙ্কনের সময় পরিকল্পিত ছকে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রাণিত হয়েই নারীর প্রতি লিঙ্গবৈষম্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯১ সালে 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে' বাঙালি নারীসমাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন:

> আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের এক রকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নাই। আমার তো এইরকম বিশ্বাস। তুমি বলবে, এখন পর্যন্ত এইরকম চলে আসছে কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে।[৭]

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কখনোই ইউরোপীয় আদর্শে বাঙালি সমাজে নারীর স্বাধীনতা চাননি। এ বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই নারীসমাজের বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে পুরুষ-সমাজের অধঃস্তন হিসেবেও গণ্য করেছেন।[৮] দ্বিতীয়ত নারীর বৌদ্ধিক দৌর্বল্যের পাশাপাশি শারীরিকভাবেও তাদেরকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন চূড়ান্ত বৈষম্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই লিঙ্গবৈষম্যের পক্ষে যুক্তি হিসেবে নারীর সন্তান ধারণের কথা উল্লেখ করে নারীসমাজকে গৃহকোণের দিকে গৃহলক্ষ্মী হিসেবে ঠেলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। গৃহাভ্যন্তরেই বাঙালি নারীর মর্যাদাকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন তিনি। বাঙালি সমাজে তিনি নারীদেরকে স্বামীর উপর নির্ভরশীল মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

> [...] আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পারো, বাপভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পারো– কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায়ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বসবে, তখন সমকক্ষ ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়েদের পক্ষে কী রকমে সম্ভব। এইরকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়ের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে-কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে। এক সন্তানধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে; তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার জো নেই।[৯]

নারীসমাজের স্বাধীনতার বিপক্ষে 'রমাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে' লেখা পত্রে রবীন্দ্র-মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি নারীর বাহ্যজীবনের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সমালোচনা করেছেন এবং প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে নারীকে গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই মনে করেন:

> [...] পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ের আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।[১০]

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে ফেনিয়ে ওঠা নারী-স্বাধীনতার সুস্পষ্ট বিরোধিতাও করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১১] আধুনিককালে বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট কল-কারাখানায়

পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজ তাদের মর্যাদা ও সামাজিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কর্মে নিয়োজিত হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন :

> কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্ন সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড় সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে।
>
> [...] বাষ্পীয় কল স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।
>
> ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে, পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তান পালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।[১২]

উনিশ শতকের শুরুতে আধুনিককালের নারী-স্বাধীনতার যে দাবি উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা সাদরে গ্রহণ করতে পারেননি, বরং সরাসরি নারী-স্বাধীনতার বিরোধিতাই করেছিলেন তিনি। এজন্য তিনি সমাজঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্য রচনার সময় যেসব নারী-চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তারা প্রায়শ পুরুষতন্ত্রের তথা পুরুষবাদী সমাজের অনুগামী।[১৩] অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনী বর্ণনার মায়াজালে নারীসমাজের এ পরাধীনতাকেও ভাষার কৌশলে যৌক্তিক পরম্পরায় বিন্যস্ত করেছেন। ফলে, খুব খালি চোখে বা উপরিস্তরের দৃষ্টিতে নারীসমাজের এ পরাজয় বা লৈঙ্গিক বৈষম্যের ইতিবৃত্ত রবীন্দ্রোপন্যাসের কত গভীরে প্রোথিত তা বোঝা যায় না। বরং গভীর পর্যবেক্ষণে উপলব্ধি ঘটে, রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

২.

বিনোদিনীর স্বাধীনতা সন্ন্যাসব্রত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চোখের বালি* [১৯০৩] উপন্যাসের বিনোদিনী শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যে আলোচিত, সমালোচিত এবং একই সময় নন্দিত-নিন্দিত এক অনন্য নারী-চরিত্র। *চোখের বালি*'তে বিনোদিনী প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও ঘটনাপ্রবাহে আশালতার ভূমিকাও এ উপন্যাসে কোনো অংশেই কম নয় এবং তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। কারণ, আশাকে কেন্দ্র করেই বিনোদিনীর প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে– লাভ করেছে ভিন্নতর মাত্রা কিংবা নবতর অভিপ্সা। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে মহেন্দ্র-বিনোদিনী, বিহারী-আশা চরিত্র মূলত বিচিত্র খাতে ধাবিত করেছে; তবে বিনোদিনীর সাথে মহেন্দ্রের সম্পর্কের মাত্রা ও আকর্ষণই এ উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি। আশা-বিহারীর কখনো সবল আর কখনো দুর্বল প্রতিক্রিয়ায় বিনোদিনী-মহেন্দ্রের সেই সম্পর্কে নবতর পর্যায় ও মাত্রা তাদের অনুভব ও উপলব্ধিতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে মাত্র। বিহারীর সবল পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব আকর্ষণ করেছে বিনোদিনীকে কিন্তু পরক্ষণে তার অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান এ নারীকে ঈর্ষাগ্নিতে নিমজ্জিত করলে সে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। বিনোদিনীর ঈর্ষাই মূলত তাকে মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য

সর্বনাশ করতে প্ররোচিত করেছে। অন্যদিকে বিনোদিনীর কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে আশার চারিত্রিক দুর্বলতা। বিশেষত আশার সরল বিশ্বাস, গৃহকর্মে অনৈপুণ্য এবং শিথিলতায় তার দাম্পত্যজীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আশার প্রতি বিহারীর সংগোপন সংরাগ ও আকর্ষণ তাকে নৈতিকভাবে মহেন্দ্রের ওপর থেকে তার প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে বিনোদিনীর ভূমিকায় আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্যজীবন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়লে বিহারী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের সাংসারিক জীবনের কল্যাণকামী ভূমিকা পালনের সুযোগও হারিয়েছে নৈতিকভাবে। এভাবে উপন্যাসের মূল সংকট বিহারী-আশা ও মহেন্দ্র-বিনোদিনীর জীবনপ্রবাহের বিচিত্র ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত হয়ে পুনরায় বিবর্তিত বিকশিত পরিবর্তিত এবং নিয়মানুগ ক্রমোত্তরণের মাধ্যমে পরিণাম লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *চোখের বালি* উপন্যাসে বিনোদিনীর চরিত্রে লৌকিক স্থূলতার পাশাপাশি আদর্শিক জীবনচেতনারও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যে বিনোদিনী একদা জাগতিক চাওয়া-পাওয়াকে যেকোনো মূল্যে লাভ করতে মরিয়া হয়েছে, সেই নারীই পরিণামে প্রণয়বহ্নিতে স্নাত হয়ে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মর্যাদা ও গৌরব বোধ করেছে। বিনোদিনীর এই মানসিক পরিবর্তন সহসা সংঘটিত হয়েছে এমন বলার অবকাশ নেই। কারণ, মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ আর বিহারীর প্রতি তার ব্যাকুল আকর্ষণ ক্রমোত্তরণের মাধ্যমে যথাযথ যৌক্তিক পরম্পরায় বিকশিত হয়েছে। প্রণয়-ঈর্ষা নামক একটা প্রচণ্ড জ্বালা তাকে মহেন্দ্রের প্রতি প্রণয়াভিনয়ে সাময়িকভাবে উৎসাহিত করেছিল। বিনোদিনীর এই ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকের বিভ্রম হিসেবে গণ্য করেছেন। নারীর কল্যাণীয় গৃহলক্ষ্মী মহিমায় বিনোদিনীর সেবাপরায়ণ মানসিকতার মধ্য দিয়ে মূলত মহেন্দ্রের অহংকার পরাজিত করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মহেন্দ্রের ভালো-মন্দের অনুক্ষণ সংবাদাদি সংগ্রহ, তাকে শাসন এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে বিনোদিনী মূলত নিজের প্রেমের কদর ধরে রাখার নারীসুলভ ছলনাকে ব্যবহার করেছে মাত্র। তার চিত্তদৌর্বল্য বিনোদিনীকে সর্বাংশে আত্মনিবেদনের সুযোগ দেয়নি। মহেন্দ্রের অস্থির চিত্তবৃত্তির সন্ধান পেয়ে পরিণামে তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের উপর ক্ষণস্থায়ী বিজয়কেতন ওড়াবার মোহ ত্যাগ করে বিহারীর অটল-অচল-অচঞ্চল হৃদয়মন্দিরের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করেছে। প্রণয়ের খেলায় এক সময় বিনোদিনীর মনে হয়েছে, বিহারী অমূল্য রত্ন; সেই রত্নের সামনে মহেন্দ্রের প্রণয়োত্তেজনা ক্ষণিকের বিভ্রম অথবা ভীষণভাবে ভঙ্গুর ও দুর্বল। অমূল্য রত্ন বিহারীর প্রণয় পাওয়ার প্রত্যাশায় বিনোদিনী সম্ভবত নিঃসংকোচে মহেন্দ্রের প্রণয়কে পুতুল খেলার মতো ভেঙে দিয়েছে।[১৪] এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যথাযৌক্তিক জীবনতৃষ্ণ বিনোদিনীর জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যে ভক্তিধারায় প্রবাহিত করেছেন তা ঠিক শিল্প-বিচারের মানদণ্ডে বাস্তবসম্মত হয়েছে, তা বলার অবকাশ নেই। বলা যায়, বিনোদিনীর জীবনবাদী চেতনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশাকে পরিণামে রবীন্দ্রনাথ গলাটিপে হত্যাই করেছেন; তাকে মহেন্দ্রের মায়ের সাথে কাশীতে পাঠিয়ে দিয়ে। বিনোদিনীর এ ধরনের পরিণাম প্রসঙ্গ ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন :

> হঠাৎ বিনোদিনীর এই অভাবনীয় অস্বাভাবিক পরিণতি কি করিয়া হইল, কেন হইল? না ইহা আর্টের দিক হইতে সত্য, না অখণ্ড জীবন-দর্শনের দিক হইতে। গল্পের ভিতর হইতে অনিবার্যভাবে এই বিনোদিনী গড়িয়া উঠে নাই; যে স্থূল বাস্তবতা বিনোদিনীর চরিত্রের

> বৈশিষ্ট্য, তাহার সঙ্গে এই ধরনের কল্পলোকের আদর্শবাদের সংযোগ ও সমন্বয় কোথায়? আর অখণ্ড জীবন-দর্শনের দিক হইতেই বা ইহার যৌক্তিকতা কোথায়? ঘটনা-চক্রে যে জীবন-বিড়ম্বিত সে জীবন পাইবার জন্য মূল্য তো কম দেয় নাই, তবু তাহার কলঙ্ক-স্পর্শবিহীন প্রেম প্রেমের তীর্থে পৌছিয়া জীবনের সার্থকতা পাইবে না কেন? যে-যুক্তি দিয়া সে বিহারীকে নিরস্ত করিল সে-যুক্তি ত সামাজিক যুক্তি, তাহা না আর্টের যুক্তি, না অখণ্ড জীবন-দর্শনের।[১৫]

সমালোচকের উদ্ধৃত বক্তব্যে স্পষ্টতই বিনোদিনীর পরিণামকে শৈল্পিক বিচারে গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন। বস্তুত বিনোদিনীর জীবন-পরিণাম ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আরোপিত। ফলে তা আর্টের সত্য কিংবা জীবনের বস্তুগত সত্য হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি; বরং বলা ভালো– এটা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া সামাজিক সত্যের প্রতিফলন মাত্র।

সৈয়দ আকরম হোসেন *চোখের বালি*'র সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা বিবাহ-বিষয়ক সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে *বিষবৃক্ষ* [১৯৭৩] ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* [১৯৭৮] উপন্যাসের রোহিণী-কুন্দনন্দিনীর তুলনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে গার্হস্থ্য রোম্যান্স রচনায় প্রাণিত, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বাস্তবস্পর্শী ব্যক্তিত্বের জটিলতম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ঘাটানে স্থিতধী।'[১৬] সৈয়দ আকরম হোসেনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত হওয়ার অবকাশ নেই। কারণ, তিনি সরল যুক্তিতে বঙ্কিমের নায়িকা রোহিণীকে রোমান্টিকতার অতলে নিক্ষেপ করেছেন; উপরন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে বিনোদিনীর বাস্তবজীবন সম্বন্ধে যে ওকালতি করেছেন, তার স্বপক্ষে জোরাল যুক্তি হাজির করাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর। কেননা রবীন্দ্রনাথ রক্তেমাংসে গড়া 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীকে পরিণামে কাশীযাত্রী এক সন্ন্যাসিনীতে পরিণত করেছেন। যৌক্তিক বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ পরিণামে বিনোদিনীকে যে আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত করেছেন[১৭] সেই জীবনকে ইহলৌকিক বা জাগতিক জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা যথাযৌক্তিক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া অসম্ভব। অথচ সরল সমীকরণ বা যুক্তির ভিত্তিতে সৈয়দ আকরম হোসেন বিনোদিনীর মূল্যায়ন করে লিখেছেন :

> বস্তুতঃ জীবনবঞ্চিত বিনোদিনী যখনই তার মর্যাদা অহং শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেখেছে, তখনি সে হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন। তখনি ঈর্ষাবোধ প্রতিশোধস্পৃহা বিনোদিনীর সুকুমার মানসিক ঔদার্য ও চিত্তমহত্ত্বকে করেছে বিনষ্ট। এর মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ বিনোদিনীর সমগ্র জীবনপ্যাটার্নে মূলীভূত। অপরপক্ষে বিহারীর কাছে বিনোদিনীর আত্মসমর্পণ করার কারণ তার ভোগলিপ্সা কিংবা স্থূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ নয়; তার শ্রদ্ধান্বিত ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা।[১৮]

এ মন্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যায়, সৈয়দ আকরম হোসেন *চোখের বালি*'র নায়িকা বিনোদিনীকে রোমান্টিক নায়িকা না ভেবে 'বাস্তবস্পর্শী' মানবী হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী এবং তাকে বঙ্কিমের নায়িকা রোহিণীর চেয়ে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। আবার সেই রোহিণীকেই কিন্তু বাস্তবতার 'স্থূলতা'য় যুক্ত করেছেন। যেহেতু রোহিণীর জীবনে ভোগ ছিল, ভোগের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার প্রবল। এটা সত্য যে, বাস্তবজীবন কখনোই ভোগাকাঙ্ক্ষা কিংবা স্থূলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাবদ্ধতার কারণেই বিনোদিনীকে রোমান্টিকবৃত্তের বাইরে বেরিয়ে বাস্তবতার মাটিতে নিয়ে আসতে ব্যর্থ

হয়েছেন। একথার পক্ষে বিনোদিনী চরিত্রের পরিণাম সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায়ের যুক্তি এরকম:

> লেখক বিনোদিনীকে একটা অনিবার্য পরিণামের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন পাঠকের মনের একান্ত বাস্তবানুভূতির মধ্য দিয়া, কিন্তু শেষ সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বেই হঠাৎ সামাজিক বাস্তবনিষ্ঠা তাহার শিল্পী-মানসকে অভিভূত করিয়া দিল, বিনোদিনীর অনিবার্য পরিণাম না ঘটাইয়া তাহাকে তিনি কল্পলোকের ভাবাদর্শের মধ্যে বিসর্জন দিলেন। জীবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথও তাহাকে বঞ্চনা করিলেন।[১৯]

রবীন্দ্র-গবেষক নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র *চোখের বালি* উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্র সম্বন্ধে; অথচ সার্বিকভাবে রবীন্দ্রোপন্যাস বিবেচনা করলে অনুমান করা যায়, তাঁর কোনো উপন্যাসের নারী-চরিত্রের পরিণামই পাঠকের ফেনিয়ে ওঠা প্রত্যাশা মাফিক হয়নি। বরং তা একটি বিশেষ আদর্শের মূর্তিতে অথবা চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিণাম লাভ করেছে। এ ব্যাপারে উপন্যাসের চরিত্র সৃজনে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা কিংবা সফলতা নিয়ে পৃথক গবেষণা কিংবা মূল্যায়নের সুযোগ আছে। উপন্যাসে সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলোর পরিণাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বরং সমগ্র রবীন্দ্রোপন্যাস প্রসঙ্গেই প্রশ্ন তোলা যায়, শুধু কী বিনোদিনীর পরিণামই অপ্রত্যাশিত? কেননা বিনোদিনীর মতো একই পরিণাম তো বিমলার [ঘরে-বাইরে], কুমুদিনীর [যোগাযোগ], দামিনীর [চতুরঙ্গ] সর্বোপরি লাবণ্যের [শেষের কবিতা] ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

আশা *চোখের বালি* উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র নয়। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ-সারল্যে উচ্ছলা-চঞ্চলা এবং সংসার অনভিজ্ঞা চপলমতি এক বাঙালি গৃহবধূ রূপে চিত্রিত করেছেন। সংসারজ্ঞানে আশার অপরিপক্কতার সুযোগে আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতার জালে বিনোদিনী জড়িয়ে পড়লেও আশার সরলতা এবং মান-অভিমান বিনোদিনীকে যে সুযোগ করে দিয়েছিল বিপর্যয় সংঘটনের– তা অনস্বীকার্য। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সর্বগ্রাসী যে প্রণয় চিত্রিত হয়েছে এবং যে প্রণয়ের জন্যই প্রথমে সে [মহেন্দ্র] বিনোদিনীকে আমলই দেয়নি। পরে আশার বিচ্ছেদে অসহিষ্ণু মহেন্দ্রের প্রণয় তার [বিনোদিনীর] প্রতি আকৃষ্ট করতে সহায়তা করেছে। মূলত আশার অনুপস্থিতির ছিদ্রপথেই তাদের দাম্পত্যজীবনে অশনিসংকেতের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল। বিনোদিনী মূলত আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্যজীবনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে মাত্র। এমনকি আশার নিকট থেকে তার স্বামীকে সাময়িকভাবে চুরি করতেও সক্ষম হয়েছিল বিনোদিনী। কিন্তু পরিণামে রবীন্দ্রনাথ আদর্শনারী আশার ঘরেই স্বামী মহেন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সংযত শান্ত-সুস্থির, অন্ধ-পতিপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাঙালি সাধারণ গৃহবধূ আশারই বিজয় ঘোষণা করেছেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশার কতটা ভূমিকা তা চোখে দেখার উপায় নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শপ্রীতি এবং বিনোদিনীকে উপেক্ষার ঘটনা উপন্যাসের পরতে পরতে দৃশ্যমান। সুতরাং উপন্যাসের পরিণামে বিনোদিনীর সন্ন্যাসজীবন এবং সংসারের গৃহলক্ষ্মী আশার ঘরে মহেন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে আশার বিজয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত সমাজের পুরুষতন্ত্রের প্রতিই সমর্থন ব্যক্ত

করেছেন। নারীকে তিনি গৃহের বাইরে স্বাধীনতা যেমন দিতে চাননি তেমনি প্রথাগত বাঙালি সংস্কারের বাইরেও নারীকে প্রতিস্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

৩.

কমলা-হেমনলিনীর অসহায় আত্মসমর্পণ

নৌকাডুবি [১৯০৬] উপন্যাসের কমলা নায়িকা না হলেও হেমনলিনীর সাথে একই অবস্থানে উপন্যাসের কমলা কেন্দ্রীয় নারী-চরিত্র। এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ খুব সাধারণভাবে কমলা চরিত্রে বাঙালি নারীর প্রেমকাতরতা অনুরাগ অভিমান এবং নারী-হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি সযত্নে নির্মাণ করেছেন। এতটুকু আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও যেন এ ভঙ্গুর নারীপ্রতিমার নেই। প্রণয়-বিরহ এবং মিলনের বিচিত্র তাল-লয়ের সাথে সংযুক্ত হয়েই কমলা এবং হেমনলিনীর লৌকিক জীবনের পরিণাম ঘটেছে উপন্যাসে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে যে সুচরিতা, লাবণ্য কিংবা কুমুদিনীর মতো শান্ত-সমাহিত সংযত অথচ কোমল-অবিচল আত্মপ্রত্যয়ী নারী-চরিত্র নির্মাণ করবেন তার ইঙ্গিত হেমনলিনী চরিত্রের মাধ্যমে আভাসিত হয়েছিল। আবার একথাও সত্য, হেমনলিনী চরিত্রে *শেষের কবিতা*'র লাবণ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা যুক্তিপ্রবণ মানসিকতা, আত্মজিজ্ঞাসা যেমন নেই; তেমনি নেই *গোরা*'র সুচরিতার মতো নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশও। অথবা *যোগাযোগে*'র কুমুদিনীর মতো কবিত্বময় নারী-হৃদয়ের অনাবিল সৌন্দর্যময় প্রকাশও নেই হেমনলিনী চরিত্রে। অথচ *নৌকাডুবি*'র হেমনলিনী প্রেমিকা হিসেবে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অতুলনীয় অনির্বচনীয় এক বাঙালি নারীসত্তা। হেমনলিনীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে সৈয়দ আকরম হোসেনের মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য:

> হেমনলিনী পূর্বনির্ণীত কোন সমাজধারণাচালিত নয়, সে সুস্থির প্রেমশরণমন্ত্রে স্থিতধী, জীবনে সদর্থক পরিতৃপ্তিপ্রত্যাশী। অথচ সে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির কাছে পরাভূত। হেমনলিনী যে নলিনাক্ষের সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছিল, তা ঐ পরাভব বেদনাকে মুখাচ্ছাদিত করার জন্যেই। এর অন্তরালে হেমনলিনীর নতুন কোন মূল্যবোধের উল্লাস নেই। বস্তুতঃ তার বিবাহসম্মতির প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ছিল বেদনাময় সান্ত্বনার নিরাসক্তি।[২০]

সৈয়দ আকরম হোসেনের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে হেমনলিনীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এবং পরিণাম পূর্বেই নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে চরিত্রটির জীবনতৃষ্ণার অথবা আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি উপন্যাসে। এমনকি বিয়ের মতো জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তার ছিল 'বেদনাময় সান্ত্বনার নিরাসক্তি'।

রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের প্রথমাংশে কমলাকে অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন। কমলার উচ্ছল প্রণয়াবেগের গোঁড়ায় সযত্ন জলসিঞ্চন করেছে রমেশের দ্বিধান্বিত আচরণ। যার অনিবার্য ফলাফল স্বরূপ কমলার প্রণয়ে ক্রমোত্তরণ ঘটেছে এবং ক্রমশ সে চক্রবর্তী পরিবারের চক্রান্তের সাথে অবচেতনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। মূলত স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর অধিকার ফিরেয়ে দেয়ার জন্যই কমলার এই মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে। কমলার এই ভূমিকা অনেকাংশেই পুতুলের ন্যায় অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হওয়ার মতো ব্যাপার। যা খুব সাধারণ বিচারেও চরিত্রটির স্বকীয়তাকে নষ্ট করেছে। অর্থাৎ কমলার কোনো কথা তার থাকেনি। সমাজের আর পাঁচজন সাধারণ নারীর মতো সেও নলিনাক্ষকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য স্বীয় ব্যক্তিত্ববোধ একেবারে লুপ্ত করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীকে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি, প্রথা-বিশ্বাস এবং সংস্কারের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে উপস্থাপন করেছেন যেখানে নারীর ব্যক্তি অস্তিত্ব সঙ্গত কারণেই লুপ্ত হয়ে গেছে। উপরন্তু কাহিনীর বিন্যাস কৌশলে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের প্রশ্ন তোলারও কোনো সুযোগ রাখেননি।

নৌকাডুবি উপন্যাসে কমলা ও হেমনলিনী বাঙালি নারীসমাজের খুবই সাধারণ ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতীক। তাছাড়া উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে উভয় চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কোনো বিশেষত্বও লক্ষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বাঙালি সমাজে নারীর চূড়ান্ত আশ্রয় হিসেবে গণ্য করেছেন স্বামীগৃহ; হেমনলিনী এবং কমলার জীবনেও একথা সমানভাবে সত্য। তাই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক এ গল্পেও শিল্পিত সৌকর্যে স্বামী-সংসার-প্রণয়-ভক্তি তথা গার্হস্থ্য জীবনপ্রীতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিই বাঙালি নারীর সর্বস্ব হিসেবে নির্দেশ করেছেন। *নৌকাডুবি*'র কমলা ও হেমনলিনীকে বাঙালি সমাজের প্রথানুগত পুরুষবাদী চিন্তাচেতনার অধীনস্ত হিসেবে অঙ্কন করেছেন।

৪.
শিক্ষিতা সুচরিতার অবগুণ্ঠন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাকাব্যসম উপন্যাস *গোরা* [১৯০৯]। এ উপন্যাসে তত্ত্বের জটাজালে পাওয়া যায় সুচরিতা ও ললিতা নামের গুরুত্বপূর্ণ দুই নারী-চরিত্র। উপন্যাসের বিচিত্রমুখি ঘটনাপ্রবাহের অবস্থানগত বিবেচনায় সুচরিতা নায়িকা হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখলেও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সামগ্রিক ঘটনায় কোনো নায়িকা নির্ধারণ করেননি। তিনি এ উপন্যাসের কেন্দ্রে সংস্থাপন করেছেন ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং সামাজিক জীবনের জটিলতা। এসব তত্ত্ব-জটিলতার ছিদ্রপথে অবশ্য মানবজীবনের যে লৌকিকতা আছে তারই সূত্র ধরে বিচিত্রমুখি হয়ে উঠেছে কাহিনি ও চরিত্রের সংঘাত-সংঘর্ষের দ্বিবাচনিক প্রতিক্রিয়া।

গোরা উপন্যাসে ললিতার সাথে বিনয়ের প্রণয়ের স্বরূপ শিল্পিত সৌকর্যে চিত্রিত হয়েছে। অবজ্ঞার ছদ্মবেশে নারী-হৃদয়ে প্রণয় কতটা তীব্রতর হয়ে ওঠে তা রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে উদ্ঘাটন করেছেন ললিতার চরিত্রে। বিনয়ের প্রতি প্রথম সাক্ষাতেই ললিতার অসম্ভব আকর্ষণ এবং তার উপর স্বীয় অধিকারবোধ চাপানোর প্রবল প্রেরণা লাভ করেছে তার প্রণয়াবেগ। অন্যদিকে উপন্যাসের সুচরিতার সাথে বিনয়ের ভালোবাসার সম্পর্ক ঘটার সম্ভাবনায় ললিতার হৃদয়-মন সাময়িকভাবে প্রণয়-ঈর্ষায় আচ্ছাদিত হয়েছে। যখন এই প্রণয়সম্ভাবনার সন্দেহ থেকে ললিতা মুক্তি পেয়েছে তখন গোরার বিপরীতে বিনয়কে দাঁড় করাতে এবং তার প্রভাবমুক্ত করতে নির্মম ও কঠোর আঘাত করে তাকে [বিনয়কে] স্বীয় কক্ষপথে পরিচালনা করতে চেয়েছে। নারী-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ প্রণয়রহস্যের উপায় হিসেবেই ললিতা এ প্রভাব [বিনয়ের উপর গোরার প্রভাব] সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ললিতার প্রণয়ের প্রবল আকর্ষণে বিনয়ের চিত্ত বিচলিত না হয়ে পারেনি; এক্ষেত্রে অনেকটা অযাচিতভাবেই সে যেন যোগ দিয়েছে গোরার মতাদর্শের বিরুদ্ধে। বিনয়কে পরিচালিত করার লক্ষ্যে স্বীয় জীবনভাবনার ললিতা স্বীয় আচার-আচরণে আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে চিত্ত-চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে পরিকল্পিতভাবে। বিশেষত স্টিমারে ভ্রমণের সময় বিনয়ের প্রতি ললিতার একান্ত নির্ভরতার মধ্য দিয়ে তাদের প্রণয়ের অবগুণ্ঠিত অবস্থার আড়াল অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ ঘটলেও সেই প্রেম সরল পথে কোনো গন্তব্য খুঁজে পায় নি। বরং বাইরে থেকে ব্রাহ্মসমাজের কাপুরুষোচিত আক্রমণই ললিতার প্রণয়কে চূড়ান্তভাবে পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতাই তাকে প্রণয়ের পথে সাহসী ও সংকল্পে মুক্তকণ্ঠ করে তুলেছিল। বিনয়ের ভীরু-দুর্বল চিত্তেও যার খানিকটা সংক্রমণ ঘটেছিল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে।

বিনয়-ললিতার প্রণয়ের পথে বাধা স্বরূপ যে ধর্ম বা মতাদর্শগত তত্ত্ব ছিল, তা ললিতার প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে। তাদের বিয়ে হিন্দু মতে নাকি ব্রাহ্ম মতে হবে; এ ব্যাপারে উপন্যাসের ঘটনায় যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তির জটাজাল কিংবা তত্ত্বের বিস্তার থাকলেও শেষাবধি ললিতার ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুমতেই তাদের [বিনয়-ললিতার] বিবাহের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বিয়ের এ ঘটনার মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে ললিতার চরিত্রে কর্তৃত্বপরায়ণ দৃঢ়তা ছিল। সামগ্রিক পর্যালোচনায় অনুমান করতে অসুবিধা হয় না রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসে ললিতা চরিত্রটির অবচেতন শক্তি ছিল, যা পুরুষের ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ। ললিতা যে শক্তির সহায়তায় বিনয়কে পৃথক করে দিয়েছে, তার ঘনিষ্ঠ আপন বন্ধু গোরার মতাদর্শ থেকে, এমনকি তার উপর থেকে গোরার প্রভাব কাটাতেও ললিতা প্রণয়কে প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। ললিতার চারিত্রিক এ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরুষের উপর নারীক্ষমতার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধেও একটি ধারণা দিয়েছেন পাঠককে। তবে এর বাইরে নারীর যে আর কোনো ক্ষমতা নেই, তাও বেশ স্পষ্টভাবেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গোরা উপন্যাসে সুচরিতা অন্যতম প্রধান নারী-চরিত্র। সুচরিতা চরিত্রের স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্ববোধ, রুচি এবং জগজ্জীবন বিষয়ক ভাবনায়ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। ললিতার সাথে চরিত্রটির ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের অন্তর্গত পার্থক্য অধিকতর। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে ললিতার মনোবৃত্তি যেখানে বিদ্রোহী সেখানে সুচরিতা ধীরস্থির, বিনয়ী এবং জ্ঞানান্বষণে আগ্রহী এক নারীসত্তা। পিতার সাথেও তার সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় স্নেহ-ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ। সুচরিতা আত্মসুখে উদাসীন; সহানুভূতিপ্রবণ ও শান্ত স্বভাবের আপাদমস্তক বাঙালি নারীসত্তা। ফলে তার হৃদয়ে প্রেমও অনেকটা নিঃশব্দে নিভৃতে-নীরবে, মনের অগোচরে প্রবেশ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ললিতার মতো তীব্রতা এবং অসহনীয়তার পরিবর্তে সুচরিতার আছে শান্ত-সমাহিত সুমধুর প্রণয়ের বিষণ্ন বিস্ময়। সুচরিতার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিকভাবে প্রেমের সূচনা করেছেন গোরার উপেক্ষাজনিত অবচেতন মনের অনির্দেশ্য বেদনাবোধের মাধ্যমে। গোরার প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ার পর তার আবেদন, ইচ্ছাশক্তি আর স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস সুচরিতাকে মর্মমূল থেকে উন্মূলিত করে গোরার দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। গোরার আকর্ষণ সুচরিতার হৃদয়ে পর্যায়ক্রমে

এতটাই প্রবলতর হয়ে উঠেছে যে তাকে পিতার [পরেশ বাবু] প্রভাব থেকেও উন্মিলিত বা ব্যবচ্ছেদ করেছে। এভাবেই সুচরিতা ক্রমান্বয়ে নিজের ব্যক্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজেকে মনের অবচেতনেই রাঙিয়ে নিয়েছে গোরার আদর্শে ও বিশ্বাসে। সুচরিতা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে পিতার আদর্শে অটল থাকবে, নাকি নতুন উপলব্ধিকে আঁকড়ে ধরবে; কিংবা ভালোবাসার মানুষ গোরার অনুসরণ করবে। প্রণয়ের গোপন রন্ধ্রপথে সুচরিতার হৃদয়ে গোরার নবতর আদর্শ সন্তর্পণে প্রবেশ করেছে এবং তার প্রথাগত ধর্ম-সংস্কার ও বিশ্বাস ভাসিয়ে নিয়েছে। সব ধরনের বিরুদ্ধ প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সুচরিতা স্বভাবগত বিনয়ী ভঙ্গিতেই হিন্দুত্বের মাঝেই পরিচিত হয়েছে। সুচরিতার মতো শিক্ষিতা নারীকেও রবীন্দ্রনাথ পুরুষতন্ত্রের অনুগত হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনচিত্র সম্পর্কে আবদুশ শাকুর যথার্থই জানিয়েছেন :

> [...] ১৮৯৪ সালে জন্ম নেওয়া কবিকন্যা মীরা দেবী শিক্ষার ব্যাপারে পিতার কোনো আনুকূল্যই পাননি, তার বদলে পেয়েছেন ষোড়শী হবার আগেই বাল্যবিবাহের শিকল। প্রসঙ্গত এও স্মর্তব্য যে, রথীর শিক্ষার দোহাই দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সদ্য প্রয়াতা স্ত্রীর নির্বাচিতা পুত্রবধূ হওয়া সত্ত্বেও ১৯০৪ সালে প্রতিমার প্রথম বিয়ের সময় তার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহে সম্মত হননি। এও এক দৃষ্টান্ত বইকি, রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গবৈষম্যের।[২১]

এজন্য *গোরা*'র সুচরিতাকে শিক্ষিতা নারী হিসেবে উপস্থাপন করেও পরিণামে তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনস্ত করেছেন। *গোরা* উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে হরিমোহিনীর মূঢ় আচরণে সুচরিতা মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও প্রকাশ্যে সুচরিতা তার স্বভাবসুলভ কোমলতা ও বিনয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে কখনো উত্তেজনা কিংবা ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ প্রদর্শন করেনি বিন্দুমাত্রও। উপন্যাসের পরিণামে গোরার জন্মরহস্য উদ্ঘাটিত হলে, সুচরিতা সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে তার সংস্কার এবং পুরনো আদর্শের মধ্যেই যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। এর ফলে সুচরিতার আত্মজিজ্ঞাসু হৃদয় অতীতের সাথে কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার না করেও নতুন আদর্শকে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে বরণ করে নিয়েছে নির্দ্বিধায়।[২২] সুচরিতার প্রণয়ের অবিচ্ছেদ্য এক অনিবার্য আকর্ষণে গোরাকে তার হৃদয়ের বাহ্যিক দৃঢ়তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। একথা স্মরণীয় যে, পারলৌকিক আত্মজিজ্ঞাসার পথেই সুচরিতার পূর্ণ চারিত্রিক বিকাশ ঘটেছে। যুক্তিতর্ক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানসিক ক্রমোত্তরণের মাধ্যমে সে আরো উজ্জ্বলতর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ *গোরা*'য় সুচরিতা চরিত্রটিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন সাংসারিক কর্তব্যকর্মের চাপে সুচরিতার চারিত্রিক প্রকৃতি সত্যিকার অর্থে ফুটে উঠত না কিংবা উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও স্বাধীনতা বা মুক্তি মিলত না। এমনকি প্রণয়ের নিরঙ্কুশ অধিকারের মধ্যে দিয়েও সুচরিতার জীবন সার্থকতা লাভ করতে পারত না। যুক্তিতর্ক এবং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে মানবজীবনের অন্তর্গত রহস্য আবিষ্কার করা যায় না, তা সুচরিতার মতো মার্জিত রুচির নারী-মননের সাধারণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

নারী-চরিত্র সৃজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানসিকতা থেকেই একবার *নৌকাডুবি*'তে হেমনলিনীর প্রতি যে উপেক্ষা করেছিলেন, তারই পরিমার্জিত সংস্করণ হিসেবে 'গোরা'য় সৃষ্টি করেছেন সুচরিতাকে। এজন্য শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন হওয়ার পরও সুচরিতা নিজেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিতভাবেই তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাননি। পরিণামে গোরার আদর্শের মধ্যে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সুচরিতাকেও আত্মতৃপ্তি লাভ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে তার এই আত্মতৃপ্তি হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের বন্ধন বা পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয়া। অর্থাৎ গোরার ক্ষেত্রেও বিজয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুরুষতান্ত্রিক চেতনার-আদর্শের। অবশ্য তিনি চেয়েছেনও প্রথাগত পুরষবাদী সমাজের ইচ্ছানুসারেই গড়ে উঠুক সুচরিতার মতো শিক্ষিত নারীও।

৫.

রক্তমাংসের দামিনীর ব্যর্থজীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *চতুরঙ্গ* [১৯১৬] উপন্যাসে মানবচরিত্রের অন্তর্গত বিষয়াদি এবং মনস্তাত্ত্বিকতত্ত্ব আবিষ্কারে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রধান নারী-চরিত্র দামিনী। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে দামিনী প্রাথমিক পরিচয়ে শচীশের অন্ধ ধর্মভক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে স্বীয় মর্যাদা ও মানবিক বোধে উজ্জীবিত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পুরুষতন্ত্রের পক্ষে দামিনীর বিদ্রোহী মনোভাবকে ধর্মীয় সংস্কারের আবহে নারী-হৃদয়ের সাময়িক বিকার হিসেবে গণ্য করেছেন। দামিনীর বিদ্রোহীসত্তার বিক্ষোভ-জ্বালা পরবর্তী পর্যায় শচীশের প্রণয়মাধুর্যে সমর্পণ করে তার অশান্ত হৃদয় প্রণয়ের দ্যুতিতে শান্ত-সমাহিত করে দিয়েছেন। অথচ শচীশ তাকে গ্রহণ করেছে– রক্তমাংসে গড়া মানবীর পরিবর্তে অলৌকিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত সেবাপরায়ণ দূরাগত বা ঊর্ধ্বালোকের মানবী হিসেবে। তার এ দৃষ্টির মধ্যে মূলত লুকিয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শিক পরিকল্পনা। কেননা তিনি দামিনীর হৃদয়ে দ্রোহের অনল জ্বেলেও তাকে কোমল কমল হিসেবেই নির্মাণ করেছেন সযত্নে। কেননা নারীসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল এরকম:

> মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপ এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে; তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তা হলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়। [...] শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ এজন্যই তাঁর বিশ্বাসের অনুকূলে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে দামিনী-চরিত্রে প্রথানুগ সমাজের বিরুদ্ধে আপাত বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তার চেতনায় বিদ্রোহের একটা উগ্রতা ফেনিয়ে তুলেছেন। দামিনীর প্রকৃত স্বরপ ও মনোভাবের চূড়ান্ত রূপ লক্ষ করা যায়, পর্বত গুহায় শচীশের নিকট তার ব্যর্থ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। নারী যে চিরকালই দুর্বল অথবা কামবাসনার নিকট নারীর পরাজয় অনিবার্য– তা দামিনীর অসহায় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়। পুরুষের প্রত্যাশানুযায়ী দামিনীর সৌন্দর্য ছিল

পুরুষকে আকর্ষণ করবার মতো তীব্র। তার রূপের মোহে পুরুষ আকর্ষিত হয়েছে এবং পতঙ্গের ন্যায় তার রূপের আগুনে জ্বলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রথাগত প্রতিকৃতি এটাই। দামিনীর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ চিরায়ত পুরুষবাদী সংস্কার-চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি।

শচীশের উগ্র কামবসানার নিকট আত্মসমর্পণে দামিনীর নারী-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। কেননা নিজের ব্যক্তিত্ব, অহং [সুপার ইগো] ধুলিস্যাৎ করেও দামিনীকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে তেজদীপ্ত ব্রাহ্ম পুরুষের নিকট। ব্যর্থতা দামিনীকে থামিয়ে দেয়নি বরং গৃহিণীর কর্তব্যকর্মে মনোসংযোগ করেছে সে। অতঃপর তার রুদ্ধ প্রণয়াবেগ সংবাহিত হয়েছে ভিন্নতর পন্থায়। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীবিলাসের সাথে একটি সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে নিয়ে অবদমিত প্রণয়বাসনার অর্গল মুক্ত করে দিতে চেয়েছে জীবনপিয়াসী দামিনী। শ্রীবিলাসের সাথে তার অকুতোভয় সহজ-সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক শচীশের হৃদয়ে প্রণয়-ঈর্ষা সৃষ্টি করেছে এবং পরিণামে জেগে উঠেছে তার পৌরুষ। শচীশের ঈর্ষা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে দারুণতর হয়ে ওঠার পরিবর্তে শিথিল হয়ে পড়েছে তার সমুদ্রযাত্রার ঘটনায়। দামিনীর প্রত্যাশানুযায়ী শচীশের মনে প্রণয়-ঈর্ষা জাগলেও পরিণামে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অনেক পরে শচীশের মানসিক পরিবর্তন ঘটলে সে ফিরে এসেছে এবং দামিনীর নারী-প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। দামিনীকে নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের সাথে সর্বান্তকরণে যোগদান করার আহ্বানও জানিয়েছে শচীশ। তার এ আহ্বানকে প্রণয়াসিক্ত ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তথাপি এ আহ্বানে মানবিকতা এবং দামিনীর ব্যক্তিত্বের প্রতি কিছুটা হলেও শচীশের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেয়েছে তা অনস্বীকার্য। ঘটনার পরিণামে শচীশ স্ব-ধর্মসম্প্রদায়ের আদর্শিক এবং তাত্ত্বিক অভিঘাতে অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মানসিক পর্যায়ে দামিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছে বিনা কারণে। এরকম বাস্তবতায় জীবনপিয়াসী দামিনী নিশ্চুপ বসে থাকেনি। সেও পুনরায় পুরুষের সাথে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশেষত শ্রীবিলাসের সাহচর্যের প্রয়োজন অনুভব করেছে দামিনী। দামিনীর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির জৈবিক প্রয়োজনীয়তাকে এভাবেই লৌকিক রীতিনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ দামিনীর জৈবিক প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ একদিকে স্বীকার করেছেন, অন্যদিকে তা সামাজিক লৌকিক বৈবাহিক সম্পর্কে সংস্থাপন করেছেন পরিকল্পিতভাবে। শ্রীবিলাসকে স্বামীত্বে বরণ করে নেয়ার পর, দামিনীর হৃদয় যখন প্রণয়ের শতদল নব আশায় মুকুলিত হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেছে, ঠিক তখন সেখানে গুরু হিসেবে শচীশের নাটকীয় আগমন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে হত্যা করেছেন দামিনীর সব লৌকিক আশা-আকাঙ্ক্ষা। উপন্যাসে এজন্যই দামিনীর দাম্পত্যজীবনও স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ লাভের অবকাশ পায়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে জীবনতৃষ্ণা দামিনীর জীবনে মুকুলিত করে তুলেছিলেন পরিণামে তাকে সাময়িক সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েও নারীধর্মের আদর্শিক অঙ্গীকারবশত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন।[২৪] একদিকে দামিনীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে সেই প্রণয়বাসনাকে তিনি সুকৌশলে অবরুদ্ধ করেছেন শচীশের ধর্মোন্মাদনায়। মূলত রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনানুযায়ী অপ্রত্যাশিতভাবে শচীশের জীবন থেকে

দামিনীকে এবং তার প্রণয়কে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে তুলে দিয়েছেন শ্রীবিলাসের হাতে। কিন্তু সেই দাম্পত্যজীবনেও দামিনীকে পূর্ণতা দেননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় আদর্শিক অবস্থান থেকে বাঙালি সমাজজীবনে নারীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা চেয়েছিলেন কিনা সেকথা বা প্রশ্ন তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত নারীদের জীবনপরিণাম দৃষ্টে খুব সঙ্গত কারণেই সমকালের নারীবাদী সাহিত্য-সমালোচকরা উত্থাপন করতে পারেন এবং করেছেনও। উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধানকল্পে বলা যায়, সমকালে যেভাবে নারীস্বাধীনতার দাবি উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ তা ভারতীয় নারীসমাজের ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকে রমাবাইয়ের প্রদত্ত এক বক্তৃতা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রে নারীস্বাধীনতা বিষয়ক বিরোধিতার ব্যাপারটি স্মরণ রাখলে, আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। রমাবাই নারীস্বাধীনতা বিষয়ক বক্তৃতায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার দাবি করেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। রমাবাইয়ের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় তিনি পরবর্তীতে রমাবাইয়ের সরাসারি সমালোচনা করে এক পত্রে নারীস্বাধীনতার বিপক্ষে তাঁর যুক্তি তুলে ধরে লিখেছিলেন :

> রমাবাই যখন বললেন, মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ করতে পারে, তখন পুরুষ উঠে বলতে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ করতে পারত; কিন্তু তা হলে এখন পুরুষদের যে-সব কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তা হলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি'কে ভূমিস্যাৎ করা রমাবাই কিংবা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি শুধু নারী-স্বাধীনতার বিরোধিতাই করেননি একইসাথে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকেও প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

> [...] পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।[২৬]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পুরুষের অধীনস্ত থেকে নারীকে যতটুকু সম্ভব ততোটুকুই স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও নারীস্বাধীনতাকে তিনি মেনে নেননি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সাহিত্য তো বটেই, তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনেও নারীস্বাধীনতার অনুকূলে ছিলেন না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যেমন উদাসীন ছিলেন, তেমনি বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন।[২৭] রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে আবদুশ শাকুর মন্তব্য করেন :

> ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর পুনর্বিবাহের এমন বিরোধী পুরুষকে মহাপুরুষ ভাবা যায় না, অথচ তিনি [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আজও 'মহর্ষি' অভিহিত। তাতে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তবে আমাদের প্রচণ্ড শিরঃপীড়া বোধ করি যখন দেখি মেয়ের বাল্যবিবাহপন্থী এবং বিধবাবিবাহপরিপন্থী এই পিতৃদেব এসব অবৈধ ও অনৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো অমূল্য পুত্রটিকেও রাহুর মতো গ্রাস করে রাখেন আমরণ।[২৮]

একথা সত্য, পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত অনড় অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন, এমনকি জোড়াসাঁকো পরিবারে তিনিই প্রথম বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথা ভঙ্গ করেছিলেন।[২৯] তথাপি দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসে তিনি কোনো বিধবার বিয়ে মেনে নেননি। পারিবারিক জীবনে বিধবাবিবাহের বিষয়টি মেনে নিলেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু হতে দেননি।

৬.
জীবনপিয়াসী বিমলার পরিণাম করুণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিকল্পানানুযায়ী *ঘরে-বাইরে* [১৯১৬] উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর প্রকল্পিত আদর্শবাদের মাঝখানে এ উপন্যাসে টেনে এনেছেন উনিশ শতকের আধুনিকতায় বেড়ে ওঠা নারী বিমলাকে। তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিমলার নারী-জীবন বহুমাত্রিক জটিলতার ভিতর দিয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শবাদের মাঝে বিমলাকে ফেলে একদিকে তার নারীমনের অন্তর্গত জটিলতা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন অন্যদিকে স্বামী-সংসারের প্রতি নারী-হৃদয়ের সহজাত স্নেহ-ভালোবাসা ও দায়িত্বকর্তব্যের টানাপোড়েন তৈরি করেছেন। কেননা, তাঁর আদর্শনারী হিসেবে বিমলাও স্বামী-সংসারের গৃহলক্ষ্মী চিহ্নিত হয়েছে।[৩০] বাঙালি সমাজের গৃহাভ্যন্তরে নারী যে কতটা মানানসই সেকথা ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : 'আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের দাম্পত্যজীবন এবং তাদের সংকটের চিত্র দেখেই মূলত এ তুলনা করেছিলেন। নারীকে গৃহের লক্ষ্মী হিসেবে গণ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। তিনি মনে করেন, নারী যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন না করে তাহলে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সংকট প্রবলতর হয়ে উঠবে।[৩২] নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মত ব্যক্ত করলেও রবীন্দ্রনাথ নারীসমাজকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বাইরে রাখার পক্ষপাতী। নারীর কর্ম গৃহের বাইরে নয়; এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট মত দিয়েছেন :

> যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্য দিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাহাদিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্মপ্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্বরা পরিপূর্ণ বিচিত্র-ফলশালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি, এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে।[৩৩]

বিশ শতকের শুরুতেই বাঙালি নারীসমাজ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয়ে তারা পুরুষের মতো সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে ভাবতে গিয়ে কতটা গোলমাল তৈরি করেছিল মূলত তাই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পারিবারিক জীবন

থেকে বেরিয়ে বিমলা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালন করতে যাওয়ায় মূলত তার ব্যক্তিজীবনে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাপ্রবাহে স্বদেশী আন্দোলনের অহিংস এবং সহিংস রাজনৈতিক আচরণের তাত্ত্বিক জটিলতার মাঝখানে অন্তঃপুর থেকে বিমলাকে নিয়ে এসে বাইরের জীবনে আধুনিকমনস্ক আদর্শচেতনায় নারী-পুরুষের বিভেদ দূরীভূত করার প্রকল্পিত ঘটনা আরোপ করে নারীসমাজকে মানবিকতায় আলোকিত করতে চাইলেও পরিণামে বিমলাকে নমনীয় বাঙালি গৃহবধূর যথাযোগ্য স্থান গৃহকোণেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বামী নিখিলেশ আর স্বদেশী আন্দোলনের সহিংস নেতা সন্দীপের আদর্শবাদের সংঘাতে বিমলার কোমল নারী-হৃদয়ে জেগেছে প্রণয়বাসনা; যার সাথে অনিবার্যভাবে সাংঘর্ষিক হয়েছে বাহ্যিক আদর্শবাদ ও সংসারজীবন। নিখিলেশের উঁচুস্তরের আদর্শবাদী অবস্থানের উদারতা বিশেষত অন্তঃপুরবাসিনী বিমলাকে শাসনহীন অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের মধ্যেই নৈতিক অত্যাচার সুপ্ত ছিল। অন্যদিকে নিখিলেশের হিমশীতল প্রণয়মন্দিরের রন্ধ্রপথে সন্দীপ একটা ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছিল মাত্র, পূর্ণাঙ্গভাবে তাকে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত চরিত্র নিখিলেশের অবাধ উদারতা আর স্বাধীনতার বিশাল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনচেতনায় উদ্বোধিত বিমলা যেন নিজের অজান্তেই সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। নিখিলেশের আচরণের অবসরেই বিমলার নারী-হৃদয়ে রক্তমাংসের তুচ্ছতায় দুষ্ট লৌকিক তথা সীমার নাগালে থাকা মানুষ সন্দীপের প্রতি ক্ষণিকের এক মোহ তৈরির সুযোগ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসে ঘটনার নানান ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একসময় সন্দীপের প্রতি বিমলার মোহ বিনষ্ট হয়েছে। সন্দীপের প্রতি বিমলার আকর্ষণ বিনষ্টির পেছনে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো তিনি পরিকল্পিতভাবেই সন্দীপের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিয়েছেন। সন্দীপের জন্য বিমলার হৃদয়ে গড়ে ওঠা উঁচু ভাবনা তার নিজস্ব উপলব্ধিতেই পরে নষ্ট হয় এবং বিমলা বুঝতে পারে– সন্দীপ সম্বন্ধে সে অতিমূল্যায়ন করেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে বিমলা পরিণামে স্বামী নিখিলেশের অবরুদ্ধ উঁচুদরের প্রণয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল কিনা তাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে স্পষ্ট জানাননি। বরং বিমলাকে একান্ত অনুগত পত্নীর ন্যায় নিখিলেশের পিছুপিছু কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে পারিবারিক নারী-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পরিণামে বিমলা স্বামীর সাথে কলকাতায় গমন করলে বোঝা যায়, তাকে বিশ শতকীয় যে আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন শেষাবধি তার পতন ঘটিয়েছেন। সমকালীন নারীবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক বিচারে প্রতীয়মান হয় বিমলাকে একপ্রকার হত্যাই করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে রায় দিয়েছেন, বিজয়ও দেখিয়েছেন পুরুষের।

উপন্যাসের ঘটনাক্রমে বিমলার স্বামী-সংসার থাকার পরও তার হৃদয়ে প্রণয় [পরকীয়া] সংক্রান্ত যে আবেদন সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র সহিংস উত্তেজনায় নিখিলেশের নিষ্ক্রিয়

নীতিবাদ, অবিচল অহিংস অবস্থান এবং অন্যদিকে সেই আন্দোলনের সাথে সন্দীপের সক্রিয়তা চাতুর্যপূর্ণ অথচ সাহসী[৩৪] অংশগ্রহণের ঘটনায় বিমলার হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। তার মনে হয়েছে, নিখিলেশ কাপুরুষ, দুর্বল এবং নীতি-বিবর্জিত ভীতুপ্রকৃতির মানুষ। সন্দীপের স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে সক্রিয়তার দিকে তাকিয়ে বিমলা তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। বিশেষত তার বাহ্যিক দেশপ্রেমমূলক কার্যক্রম আর সুভাষণে প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছে বিমলা। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সন্দীপের মুখ দিয়েই বিমলাকে স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী আখ্যা দিয়েছেন এবং তাকে গৃহকোণে নিশ্চুপ বসে না-থাকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাকে আরও বুঝিয়েছে সন্দীপ, পতিপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম মহৎ এবং মহান্‌ব্রত।[৩৫] একইসাথে বিমলার মানসিক চেতনায়ও একটা প্রভাব অবচেতনে বিস্তার করেছে সন্দীপ। বিশেষত সন্দীপের আচার-আচরণ, পৌরুষদীপ্ত বাইরের রূপচ্ছটায় বিমলা কখন অবচেতনে তার প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণের মোহে অন্ধ হয়েছে। উত্তাপহীন নিখিলেশের প্রণয় তার নিকট ম্লান হয়ে পড়েছে– একথা সে বুঝতেও পারেনি। বিমলা যখন পতঙ্গের ন্যায় সন্দীপের প্রণয়ানলে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে নারী-ধর্মের প্রতি অবিচল রাখার চেষ্টা করেছেন।

সন্দীপের দেশপ্রেম বাহ্যিকভাবে নিখিলেশের আদর্শের সামনে দ্যুতি ছড়ালেও অন্তরে সন্দীপ ঠিকই অনুভব করেছে– তার অন্তঃসারশূন্যতা। এজন্য বিমলাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি সন্দীপ ভালোবাসায় বরং সাময়িক ভোগের সামগ্রী হিসেবে মাঝপথে অনেকটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ফেলে রেখেছে। তাছাড়া আন্দোলনের প্রয়োজনে বিমলার নিকট সন্দীপের অর্থের দাবি তাদের দুজনের মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্কে উটকো ঝামেলা হিসেবে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সন্দীপের অর্থ চাওয়া এবং পাওয়া না-পওয়ার নানাবিধ জটিলতা সন্দীপ-বিমলা সম্পর্কে ভিন্নতর মাত্রা যোগ করে এবং তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাদের সম্পর্কের অনিবার্য বিচ্ছেদ প্রতিক্রিয়ায় সন্দীপের উদ্যত বাহুবিস্তারি আলিঙ্গন চরম বিতৃষ্ণায় প্রতিহত করেছে বিমলা। সবলে বিমলা নিজেকে অনিয়ন্ত্রিত প্রণয়াবেগ থেকে মুক্ত করেছে। এভাবেই *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের সার্বিক ঘটনাক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিকল্পিত ও নির্ধারিত ছক অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনার ছক অনুসারে স্বীয় আদর্শবাদের অনুকূলে পুরুষতন্ত্রের পক্ষে বিমলাকে দিয়ে খাঁটির তুল্য মানদণ্ডে মেকিত্বের মোহাবেশ ছিন্ন করিয়ে কল্যাণবুদ্ধি এবং নারী-জীবনের চিরায়ত ধর্ম-সংস্কারের পথে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। বিমলাকে নতুনের চমকপ্রদ আহ্বান থেকে ফিরিয়ে এনে পতিপ্রণয়ের মন্দিরে স্থিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সন্দীপ-বিমলার প্রণয় ও পরিণাম রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন পুরুষতন্ত্রের পক্ষে। ফলে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা-সন্দীপ শুধু কলের পুতুলের মতো রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত আদর্শের বৃত্তাবদ্ধ ছকে নিজেদের সমর্পণ করেছে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্রই সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রমানসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এজন্য তিনি পরিণামে বিমলাকে প্রচলিত পুরুষবাদী সমাজের অধীনস্ত পতিগতপ্রাণ একনিষ্ঠ নারী হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা বিমলাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন পরিণামে তাকে ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও

মর্যাদার অধিষ্ঠিত হতে দেননি। বরং উপন্যাসের শেষ পর্যায় রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে নিখিলেশের আহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছে তা রীতিমতো নাটকীয়। অপ্রত্যাশিত এ ধরনের নাটকীয় পরিবেশ-প্রেক্ষাপটে যেকেনো ব্যক্তিই তার [নিখিলেশের] প্রতি মানবিক কারণে সহানুভূতিশীল হবে অথবা হয়ে উঠতে বাধ্য। ফলে স্বামীর রক্তাক্ত দেহদর্শনে স্ত্রী হিসেবে বিমলারও মানবিক সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। সামগ্রিক ঘটনা বিশ্লেষণে বিমলার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনকে খুব স্বাভাবিক ভাবার সুযোগ নেই; বরং স্বামীর সংসারে বিমলাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সচেতন মানসিক সংশ্লিষ্টতা ছিল বলেই অনুমিত হয়। কেননা আমরা পূর্বেই অবগত আছি– তিনি সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি কাজের সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করার বিপক্ষে ছিলেন। বাইরের কাজে নারীর সম্পৃক্তার প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন:

> মনুষ্যের কতকগুলি বিশুদ্ধ ও উচ্চভাবের আকরস্থল আছে, গৃহ তাহার মধ্যে একটি। যদি পুরুষেরা উপার্জন রাজ্যশাসন প্রভৃতি বাহিরের কার্য এবং স্ত্রীলোকের স্বজনসেবা সমাজরক্ষা প্রভৃতি ভিতরের কার্য না করে তবে এই গৃহ এক দণ্ড টিকিতে পারে না। সমাজের যতই উন্নতি হয় স্ত্রী-পুরুষের কার্যবিভাগ ততই সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নরস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।[৩৬]

অতএব এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিমলা নারীধর্ম ত্যাগ করে গৃহের বাইরে দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত হোক, রবীন্দ্রনাথ তা চাননি। এজন্যই বিমলার দেশরক্ষার বাহ্য কার্যক্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিমলার ব্যর্থতাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলার স্বার্থেই সন্দীপ চরিত্রটিকেও প্রথাগত নিয়মনীতি এবং যুক্তির বাইরে রবীন্দ্রনাথ সহসাই তার অধঃপতন ঘটিয়েছেন। কেননা, সন্দীপের চারিত্রিক পতন না ঘটলে খুব একটা সাধারণভাবে নিখিলেশের উত্তাপহীন প্রণয় আর আকর্ষণহীন দাম্পত্যজীবনে যৌক্তিকভাবে বিমলকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ।

বিমলার পুরনো অবস্থানে [স্বামীগৃহে] প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও স্বাভাবিক একটা ফাঁক রয়েছে তা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও উপলব্ধি করা যায়। সন্দীপের আদর্শিক [সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন] উন্নাসিকতা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'গান্ধীবাদী' অহিংসনীতির জয়কেতন ওড়াতে গিয়ে ব্যক্তির মানবিকতাকে খর্ব করেছেন, প্রণয়ের পথকে করেছেন কণ্টকাকীর্ণ। আর তাই সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বিমলা নারী-হৃদয়ের সকল দরজা উন্মোচন করে তাকে অন্তঃপুরে আহ্বান জানাতে পারে নি। সুতরাং 'ঘরে-বাইরে'র আধুনিক চেতনাসম্পন্ন বিমলাকেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি নারীর প্রচলিত আদর্শিক স্থানে অধিষ্ঠিত করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশিত নারীমূর্তি গড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গড়া আদর্শ-নারীমূর্তিতে [বিমলা] প্রাণের অভাব সাদা চোখেই ধরা পড়ে। এই বিবেচনায় *ঘরে-বাইরে*র বিমলা ও *চোখের বালি*'র বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রাণহীন ও রক্তশূন্য মানবী হিসেবে নির্মাণ করেছেন। বিমলা অথবা বিনোদিনীর প্রাণহীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দোষী ভাবার খুব বেশি সুযোগ নেই। কারণ, বাঙালি নারীসমাজের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ইউরোপীয় ধাঁচের নারী-স্বাধীনতাকে সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ নারীকে গৃহলক্ষ্মী মনে করতেন; কথাসাহিত্যের সমাজ

বাস্তবতায় নারী-জীবন অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁর বিশ্বাসবোধেরই ন্যারেটিভ ভাষ্য নির্মাণ করেছেন।

৭.
কুমুদিনীর প্রাকৃতিক দায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *যোগাযোগ* [১৯২৯] উপন্যাসের প্রধান নারী-চরিত্র কুমুদিনী। তার স্বামী মধুসূদন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ কাহিনির শুরুতে কুমুদিনীকে একান্তভাবে স্বামী নির্ভরশীল এবং সর্বাংশে আত্মসমর্পিত বাঙালি নারীর আদর্শমূর্তি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে মধুসূদন-কুমুদিনীর যে দাম্পত্য সম্পর্ক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সেরকম স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক তৎকালীন ভদ্রবংশীয় রুচিশীল উঁচুবর্ণের হিন্দু সমাজে হরহামেশা পরিলক্ষিত হতো। অন্তত কালের বিচারে এতে বিশেষ কোনো বিশেষত্ব নেই। মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্যবিরোধের সূচনা এবং বিরোধ অবসানের পর স্বামীর ঘরে কুমুদিনী ফিরে আসার পর তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল, তা উপন্যাসে ব্যক্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা অনুযায়ী কুমুদিনীকে সন্তানসম্ভবা হিসেবে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে মূলত পাঠকের চিন্তাপ্রবাহকে মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্যজীবনের বিরাজমান বিরোধ ও সংকট থেকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে দিয়েছেন। একই প্রক্রিয়ায় তিনি দেখিয়েছেন, কুমুদিনীর সন্তানসম্ভবা হওয়ার মধ্য দিয়ে কোন্ অবসরে তাদের দাম্পত্যবিরোধ হঠাৎ করেই মিটে গেছে। এ ঘটনা কার্যকারণ পরম্পরায় উপন্যাসে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়নি। একথা খুবই সাধারণ যে, দাম্পত্যজীবনে সন্তান জন্মের সুসংবাদ যেকোনো দম্পতির কলহ মেটাতে সংযোগসূত্র তথা নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। অথচ মধুসূদন-কুমুদিনী দাম্পত্যবিরোধের মূলোৎপাটনে সন্তান জন্মের ঘটনাও যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেনি। কেননা তাদের দাম্পত্যজীবনের সংকট আরও গভীরে নিহিত ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিতভাবে কুমুদিনীকে সন্তানসম্ভবা করার মধ্য দিয়ে তাকে শারীরিকভাবেও দুর্বল করে দিয়েছেন। দুর্বল কুমুদিনী যেন স্বামী মধুসূদনের চূড়ান্ত পাশবিকতাও মেনে নিতে বাধ্য হয়। সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নারীর গর্ভধারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> [...] কথাটা শুনিতে ভালো লাগুক বা না লাগুক, জননী হওয়াই স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা এবং প্রকৃতি সেই কারণেই তাহাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন। যাহাতে করিয়া রমণীর সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও শিশুসন্তান পালনপোষণ করিবার শক্তি হ্রাস করে তাহা সমাজ ও প্রকৃতির নিকটে অপরাধস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।[৩৭]

কুমুদিনী দাম্পত্যজীবনের যে সাংঘর্ষিক বাস্তবতায় স্বামী-সংসার ছেড়েছিল সন্তানসম্ভবা না হলে, হয়তো স্বামীগৃহে সে আর ফিরত না। মধুসূদনের পাশবিকতা এবং লাম্পট্য চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্যজীবনে সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। মূলত এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুমু স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল। দাম্পত্যবিরোধের এ জাতীয় সংকটোত্তরণে কুমুকে সন্তানসম্ভাবা করা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বামীগৃহে ফিরিয়ে আনতেও পারতেন না এবং তা যৌক্তিকও হতো না। সুতরাং কুমুর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে যৌক্তিক করে তুলতেই তাকে সন্তানসম্ভবা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কুমুদিনীর নারী-জীবনে গর্ভধারণ অনুষঙ্গ যুক্ত করেছেন পুরুষতন্ত্রের ফেনোমেনা হিসেবে। এ ঘটনায় মনে হয়, সন্তান জন্ম দেয়াই যেন নারী-জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং একমাত্র সার্থকতা।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে জানিয়েছেন, মধুসূদন-কুমুদিনী সামাজিকভাবে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী হলেও তারা চিন্তাচেতনায় আলাদা দুই জগতের মানুষ। বিয়ের বন্ধন তাদেরকে সামাজিকভাবে এক সুঁতোয় গাঁথলেও দুজনই চিন্তাচেতনায়, রুচিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন মানুষ। মধুসূদনের উগ্র যান্ত্রিক মনোবৃত্তির বিপরীতে স্ত্রী কুমুদিনী ধীরস্থির শান্ত-সমাহিত অনেকটা বিকাশোন্মুখ কুসুম স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাকে এমন এক আদর্শ বাঙালি নারী হিসেবে নির্মাণ করেছেন– যে নারী তার হৃদয়ের সমস্তটুকু দিয়ে স্বামীর আহ্বানের অপেক্ষা করেছে। এজন্যই স্বামী মধুসূদনের আহ্বানের পর কুমুদিনী কোনো তর্কবিতর্ক বা বিরোধে না জড়িয়ে সম্পূর্ণ নির্ভার বিশ্বাসে বাইরের সবকিছু উপেক্ষা করে বিধির বিধানকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছে, মেনে নিয়েছে। অথচ স্বামী মধুসূদনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে কুমুদিনীর নারী-হৃদয় আশঙ্কাতাড়িত উৎকণ্ঠায় ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। এমনকি বিয়ের পর থেকেই দুই বিপরীত [কুমুদিনী-মধুসূদন] প্রকৃতির মানব-মানবীর চিন্তাচেতনার মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। শুরুটাও ছিল মধুসূদনের দিক থেকে, কুমুদিনী প্রাণপণে সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে এবং আদর্শ বাঙালি নারীর সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবজীবনকে মেলাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্বন্ধের সেতুটিও মধুসূদন তার কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারিতায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলাফল হিসেবে কুমুর সহজ-সরল আদর্শিক বাঙালি নারী-জীবনে স্ত্রীত্বের স্বপ্ন অনিবার্য অভিঘাতে ভেঙে গেছে। স্বামীর পাশবিক আচরণ তার অধিকার হিসেবে মেনে নিতে পারেনি; বিরোধিতা করবারও কোনো শক্তি কুমুদিনীকে দেননি রবীন্দ্রনাথ। বরং মধুসূদনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে কুমুদিনী নীরবে স্বামীর শয্যাগৃহ ত্যাগ করে গৃহের এক কোণে নিজেকে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে চিরায়ত বাঙালি নারীর আত্মপীড়নমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমর্পিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *যোগাযোগ* উপন্যাসে দেখিয়েছেন, ক্রমান্বয়ে মধুসূদনের আত্মম্ভরিতা এবং দাম্ভিক বংশীয় গৌরবের অহমিকায় পরিবর্তনের সুর অনুরণিত হলে তা কুমুদিনীর জীবনকে আরও বিষিয়ে তুলেছে। মধুসূদনের নতি স্বীকারের মধ্যেও কুমুদিনী দেখেছে– কামনার কালিমালিপ্ত ব্যভিচারী বাহুর ভয়ানক বিস্তার। অথচ মধুসূদনের কামবাসনা থেকে কুমুদিনীকে আত্মরক্ষার শক্তি দেননি রবীন্দ্রনাথ। বরং কুমুদিনী নিজেকে শেষাবধি রক্ষা করতে না পেরে তার সতীত্বের মানসচেতনায় ক্লেদাক্ত একটা অশুচি অভিজ্ঞতার অরুচিকর ভীতি জায়গা করে নিয়েছে।[৩৯] পরিণামে কুমুদিনীর অনাবৃত বিতৃষ্ণায় মধুসূদনের প্রণয়স্বপ্ন ও গৌরব তিরোহিত হলে তাদের দাম্পত্য বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়েছে। একথা বলা দরকার যে, প্রেমের সূক্ষ্ম পথে কুমুদিনীর হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা কোনোদিনই ছিল না মধুসূদনের। উপরন্তু অনিবার্য ঘটনা পরম্পরায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে স্থূল সূত্রে সংযুক্ত হয়েছে শ্যামা। প্রসঙ্গত একথাও সত্য যে, মধুসূদন প্রণয়িনীরূপে কখনো শ্যামাকে প্রত্যাশা করেনি, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উর্ধ্বে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্থূল ইন্দ্রিয়লালসার পঙ্কিল স্রোতে কুমুদিনী-মধুসূদনের

দাম্পত্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন মনের অজান্তেই ছিন্ন হয়ে গেছে। ভোগবাদী দাম্পত্যজীবন থেকে কুমুদিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাকে পুনরায় পঙ্কিলতায় ফিরিয়ে এনেছেন মধুসূদনের সন্তানের জননী রূপে। ফলে নারীত্বের অন্যসব পরিচয় মুছে গিয়ে কুমুদিনীর মহৎ মাতৃমূর্তি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *যোগাযোগে*'র ঘটনা প্রথাগত নারীবাদী সমালোচনার দৃষ্টিতে বিজয়কেতন উড়েছে পুরুষতন্ত্রের, অন্যদিকে ব্যর্থ হয়েছে কুমুদিনীর নারী-জীবন ও নারীত্ব। পরিণামে কুমুদিনীকে পুরুষতন্ত্রের নৃশংস-নিষ্ঠুরতার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্যজীবনে পুরুষের একাধিপত্য বিশ্বাস করতেন বলেই স্ত্রীর উপর স্বামীর অত্যাচারের পাশবিকতাও অধিকার হিসেবে মেনে নিয়ে লিখেছেন :

> আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে-ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।[৪০]

অতএব, সাংসারিক বাস্তবতায় কুমুদিনীকে পরিণামে লম্পট মধুসূদনের তথা স্বামীগৃহকেই দেবমন্দির হিসেবে গণ্য করতে হয়েছে। কেননা পুরুষবাদী রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারেই কুমুর জীবন নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'যোগাযোগে'র মতো তাঁর অন্য উপন্যাসের নারী-চরিত্র নির্মাণের সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরুষতন্ত্রের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এজন্যই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ *যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশিত নারীর সব সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য, মাধুর্য এবং অপার্থিব রমণীয়তাকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি সবসময়ই নারীর সৌন্দর্যকে বাইরের জগতের চেয়ে গৃভ্যান্তরে মাধুর্যমণ্ডিত মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। ফলে কুমুদিনীর পরিণামও পুরুষবাদী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা মাফিক ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি নারীকে যেভাবে শান্তশিষ্ট গৃহিণী-স্বভাবের তথা বাঙালির গার্হস্থ্য-জীবনের লক্ষ্মী হিসেবে গণ্য করেছেন, কুমুদিনীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরিণামে অত্যাচারী মধুসূদন তথা স্বামীগৃহকেই কুমুদিনীর একমাত্র আশ্রয় হিসেবে গণ্য করে তার জীবনের করুণ সমাপ্তি এঁকেছেন।

৮.

সাংসারিক সীমাবদ্ধতায় লাবণ্য

শেষের কবিতা [১৯৩০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ-জীবনের উপন্যাস। এটি মূলত রোমান্সধর্মী ত্রিভূজ প্রণয়নির্ভর তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান নারী-চরিত্র লাবণ্য। শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী-কবিত্বপূর্ণ নারী-চরিত্র হিসেবে লাবণ্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয়। তার সৌন্দর্য মর্ত্যলোকের হয়েও যেন অমর্ত্যলোকের অথবা ঊর্ধ্বাচারী অসীম সত্তায় লীন। নায়ক অমিতও বৌদ্ধিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ মেধাবী পুরুষ। উপন্যাসে উভয় নর-নারীর প্রণয় শত বাসনায় আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছে কিন্তু পরিণামের পথ খুঁজে পায়নি। এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হয়ে লাবণ্য-অমিতের প্রণয়-সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি ভেবেচিন্তে অমিত-লাবণ্যকে তাদের

নির্মিত প্রণয়বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রেরণ করে লৌকিক জীবনাচরণ তথা স্বাভাবিক গার্হস্থ্য-বাস্তবতায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রণয়ের ঊর্ধ্বলোক থেকে নামিয়ে এনে রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তাদের বাস্তবজীবনের দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায় প্রতিস্থাপন করেছেন। একথাও সত্য যে, অমিত ও লাবণ্যর গভীর প্রণয়সম্পর্ক লৌকিকজীবনে বা সাংসারিক বাস্তবতায় রোমান্স বা কল্পনা মাত্র। একথা লাবণ্য প্রথম উপলব্ধি করেছে এবং প্রবল মানসিক সংঘাত ও আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অতঃপর স্বীয় প্রণয়াবেগের রশি টেনে ধরে ফিরিয়ে দিয়েছে অমিতের বিয়ের প্রস্তাব এবং শোভনলালের সাথে ঘরসংসার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে লাবণ্যর এ ধরনের নাটকীয় সিদ্ধান্ত ঔপন্যাসিকের আরোপিত অথবা পূর্ব-পরিকল্পনার পরিণাম ভিন্ন অন্যকিছু নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ের ক্ষেত্রেও নারীর অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। এজন্য তিনি বন্যার [লাবণ্য] নারী-জীবনে অবাধ প্রণয়ের পরিবর্তে তাকে সীমায়িত সংসারজীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ *শেষের কবিতা*'র ঘটনাপ্রবাহে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্গত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে প্রণয়ের পরিবর্তে নারীর জন্য সংসারজীবনকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রণয়কে সংসার-জীবনেও সীমায়িত প্রশ্রয় দিয়েছেন। যার অনিবার্য ফল হিসেবে অমিত-লাবণ্যর মহৎ প্রণয়ের বিচ্ছেদকেই শ্রেয় জ্ঞানে তাদেরকে পার্থিব সংসারের [অমিত-কেটি মিত্র এবং লাবণ্য-শোভনলাল] হাতে অর্পণ করেছেন। অমিত-লাবণ্যর দাম্পত্যজীবনে প্রণয়ের অবাধ বিচরণের পরিবর্তে আছে সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শেষের কবিতা*'য় দেখিয়েছেন, অমিতের সাথে প্রণয় গাঢ়তর হলে লাবণ্য ক্রমশ সংশয়ে নিপতিত হয়েছে। কার্যত এ সংশয় তাকে অমিতের পরিবর্তনশীল মানসিকতার সাথে নারী-জীবনের ক্লান্তিহীন পথ চলা সম্ভব নয়; এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রণয়সম্পর্কের মধ্য দিয়েই লাবণ্য অন্তর্গত উপলব্ধি লাভ করেছে যে, অমিতের চিরসৃজনশীল ও পরিবর্তমান মানসিকতার সাথে সংসারজীবনের সংযোগ ঘটালে সে কোনোভাবেই তার সহযাত্রী হতে পারবে না। লাবণ্য মনে করেছে, সংসারের বন্ধনে অমিতকে সে কোনোদিনই পূর্ণভাবে পাবে না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার অনুগামী হয়েছে মাত্র লাবণ্যর সংসার-ভাবনা। লাবণ্যকে এ ধরনের সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ মননশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। উপরন্তু লাবণ্যকে দিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে তিনি নারী হিসেবেও তাকে মহিমান্বিত করেছেন। লক্ষণীয় যে, পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার সব গুণাবলী লাবণ্যর থাকলেও তাকে কোনোভাবেই পুরুষের কাতারে দাঁড় করাতে পারেননি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। বরং লাবণ্যকে বেছে নিতে হয়েছে খুব সাধারণ সংসারজীবন, অমিতের রোমান্টিক প্রণয়ের বিপরীতে। নারীপ্রবৃত্তির সংসার-ভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশ জোর দিয়েই মন্তব্য করেন:

> মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ

> যে, এতে অনেক দিন ও অনেকক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।[৪১]

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য *শেষের কবিতা*'য় অসম্ভব সাহসিকতায় প্রণয়পথের দুরন্ত যাত্রী হিসেবে লাবণ্যকে সৃষ্টি করার পরও তিনি প্রথাগত ধারণা ও আদর্শিক অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত লাবণ্যর প্রণয়কে আবদ্ধ করেছেন প্রাত্যহিক সংসারের কল্যাণকাজে। বাঙালি সমাজে নারী-জীবনের চূড়ান্ত আশ্রয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সংসারকে একমাত্র ভরসা গণ্য করেছেন। ইউরোপীয় সমাজে তৎকালে নারীর যেরূপ স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল তিনি বাঙালি নারীসমাজের উত্থাপিত অনুরূপ দাবি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না।[৪২] এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে বাঙালি নারীর জন্য গৃহকেই সকল প্রাপ্তির চূড়ান্ত ও শেষ আশ্রয় হিসেবে গণ্য করেছেন। নারীসমাজ সম্বন্ধে তাঁর মতাদর্শ তিনি প্রবন্ধাকারে, চিঠিপত্রে এবং কাজেকর্মে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের বাস্তবতায়ও নারীসমাজ সম্পর্কে তাঁর আদর্শ-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ভাবকল্পনার যে চূড়ান্ত পর্যায়ে বসে অমিত-লাবণ্যর প্রণয় সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রণয়ের আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে ধুলোবালির বাহ্যজগত নয়। এজন্য অনিবার্যভাবে প্রণয়ের সেই সেতু ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে তিনি শোভনলাল এবং কেটি মিত্রকে অনধিকার প্রবেশানুমতি দিয়েছেন অমিত-লাবণ্যর গড়ে তোলা প্রেমের গোলাপ বাগানে। উপন্যাসের শুরু থেকেই তাদের [অমিত-লাবণ্য] ফেনিয়ে ওঠা প্রণয়বাসনা পার্থিব লৌকিক জগৎ ছেড়ে পরিণামে অসীমের অভিযাত্রী হয়েছে। ফলে অমিত-লাবণ্যর প্রণয়কে লৌকিক অর্থে ব্যর্থ করে দিয়ে বিচ্ছেদের বিরহানলে তাদের খাঁটি করে তুলেছেন। আর তাই রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা-পুত্র রোমান্টিকতার জগৎ থেকে নেমে এসে নিত্যকার গার্হস্থ্য-জীবনের নির্মম বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। কাহিনিতে এভাবে যুক্তি পরম্পরা সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ নিজের আদর্শে লাবণ্য এবং কেটি মিত্রকে যথার্থ বাঙালি নারীর মর্যাদায় গৃহকর্মে নিয়োজিত করেছেন। একইসাথে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন পুরুষতান্ত্রিক বিজয়ের।

নারীর উচ্চাঙ্গের প্রণয়বাসনা আছে কিংবা থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথ একথা মেনে নিলেও লাবণ্যর ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাকে গলাটিপে হত্যা করেছেন, তাকে শোভনলালের সাথে পরিণয়সূত্রে বেধে প্রাত্যহিক সংসারজীবনে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। কেননা পরিণামে একজন নারী হিসেবে লাবণ্যকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে নারাজ রবীন্দ্রনাথ। অনুরূপ সিদ্ধান্ত কেটির ক্ষেত্রেও নিয়েছেন, নারী-জীবন পার্থিব সংসার-জীবনের ক্ষুদ্রতা এবং তুচ্ছতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাঙালি সমাজের প্রথানুগত পুরুষতন্ত্রের নিকট সমর্পিত নারী কেটি মিত্রও। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যকে ভালোবাসার অধিকার দিয়েছেন কিন্তু সেই ভালোবাসাকে পাওয়ার অধিকার দেননি। শুধু লাবণ্যর ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথ এ অধিকার দেননি– বিনোদিনী [চোখের বালি], বিমলা [ঘরে-বাইরে] কিংবা দামিনীকেও [চতুরঙ্গ]। এভাবে রবীন্দ্রোপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী-চরিত্রের ওপর 'পয়েন্ট অব ভিউ' বা প্রেক্ষণবিন্দুর আলো অভিক্ষেপ করা হলে প্রতীয়মান হয়, রবীন্দ্রনাথ কখনোই বাঙালি নারীর জন্য ইউরোপীয় সমাজের অবাধ নারী-স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন নি, প্রশ্রয়ও দেননি। ফলে তাঁর উপন্যাসের কোনো নারী অবাধ প্রশ্রয় কিংবা স্বাধীনতার সুযোগ পায়নি।

৯.

মৃত্যুতেই নীরজার মুক্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মালঞ্চ* [১৯৩৪] উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য পরকীয়া প্রণয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে *মালঞ্চ* রচনার আগেই তিনি পরকীয়া প্রণয়ের ঘটনা নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন।[৪৩] *মালঞ্চ* উপন্যাস আপাত দৃষ্টিতে আদিত্য-নীরজার সুখী দাম্পত্যজীবনের ইতিকথা হলেও সময়ের পরিবর্তনে মানুষের চেতনায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তা কখনো কখনো মানবজীবনকে বিপন্নও করে তোলে, এ উপন্যাসটিও রবীন্দ্রনাথের পুরুষবাদী চেতনায় পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

স্বামী আদিত্যের ফুলের ব্যবসা থাকায় স্ত্রী নীরজার জীবনেও ক্রমশ ফুল ভালোবাসার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বাঙালি সমাজে কথায় আছে, পতির পথেই সতীর গমন। এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদকে মেনে নিয়েই নীরজা সংসার-ধর্ম গ্রহণ করেছে। দাম্পত্যজীবনের দীর্ঘ দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নীরজা মাতৃসম্ভবা হলেও প্রসবকালে সন্তানের মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় নীরজা মানসিক আঘাতের পাশাপাশি শারীরিক দৌর্বল্যে ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। ফলে অসুস্থ শরীর নিয়ে নীরজা স্বামীকে আগের মতো বাগানের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে না। সঙ্গত কারণে দেখা যায়, আদিত্যও ব্যবসার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তবে নীরজার অসুস্থতায় কিন্তু আদিত্যের জীবন থেমে থাকে না; বরং সে একসময় সরলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এরপর থেকে নীরজরা প্রতি তার অবহেলা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্ত্রীর প্রতি আদিত্যের উদাসীনতা এতোটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে, অসুস্থ স্ত্রীর [নীরজার] সেবা-যত্নের ভার পর্যন্ত ন্যস্ত করে খুড়তুতো ভাই রমেনের ওপর। অবশ্য আদিত্যের গোপন অভিসন্ধি বুঝতে পেরে নীরজা ব্যর্থ চেষ্টা করে, রমেনের সাথে সরলাকে বিয়ে দেয়ার। যখন স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় নীরজা তখন বাধ্য হয়ে সে আদিত্যের বিরুদ্ধে সরাসরি পরকীয়া প্রণয়ের অভিযোগ উত্থাপন করে। পরিস্থিতি এমন বিব্রতকর হলে আদিত্য গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে নীরজার প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা প্রদর্শন করে। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অহং [ইগো] টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নীরজার চূড়ান্ত পরাজয়ের পুকুর তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ তাকে ঠেলে দিয়েছেন ঠাকুর ঘরে।

আদিত্যের বিরুদ্ধে নীরজা পরকীয়া প্রণয়ের অভিযোগ উত্থাপন করলে সরলা বিব্রত অনুভব করে। সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টাও করে। এদিকে গৃহত্যাগের পর আদিত্য এক পত্রে নীরজাকে জানায়, নিঃসহায় সরলার প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা। কিন্তু আদিত্যের সেই পত্রের ছত্রেছত্রে ছিল সরলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও প্রণয়ভাব। নীরজা এ ধরনের অপমান ও অবহেলা লাভের পরও রবীন্দ্রনাথ তাকে দেননি, স্বামী তথা পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। বরং প্রতিবাদের পরিবর্তে নীরজাকে তিনি ঠাকুর ঘরে দেবতার উপাসনায় নিয়োজিত করেছেন। পুনরায় আদিত্য যেদিন সংসারে ফিরে আসলো নীরজা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে সরলাকে নিজের গহনাদি নিজ হাতে পরিয়ে দিয়ে নারীত্বের চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিয়েছে। নীরজার এ আচরণে আরেক নারী সরলা বিব্রত হয়েছে; ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বিবেকের দংশনে।

প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের রীতি হিন্দু সমাজে নেই; এজন্য নীরজা বর্তমান থাকায় দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সরলাকে গ্রহণের সম্মতি দেননি। সেকালে পুরুষবাদী বাঙালি হিন্দু সমাজে দ্বিতীয় বিয়ের প্রচলন ছিল না। আবার প্রথম স্ত্রী থাকা অবস্থায় আদিত্যর পরকীয়া প্রণয়কেও মেনে নিতে পারেনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শিক মানসচেতনা। এরকম একটা পরিস্থিতিতে উপায়হীন ও অসহায় সরলাকে মিথ্যে চুরির অভিযোগে কারাগারে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী আদিত্যকে ফিরিয়ে দিয়েছেন স্ত্রী নীরজার হাতে। আদিত্য দাম্পত্যজীবনে একের পর এক অন্যায় করলেও তার কোনো শাস্তি কিংবা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেননি রবীন্দ্রনাথ।

চুরির মিথ্যে অভিযোগ মাথায় নিয়ে কারাগারের শাস্তি শেষে সরলা মুক্তি পেয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে নীরজার সংসারে। সরলার এই ফিরে আসার ঘটনায় নীরজা এতোটাই ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, স্ট্রোক করে তার মৃত্যু হয়। নীরজার এ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূলত পুরুষের যৌনভোগের পথকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কেননা স্ত্রী নীরজার মৃত্যুর পর আদিত্যের সামনে আর কোনো বাধা নেই, সরলাকে গ্রহণের ক্ষেত্রে। সরলা কারাগার থেকে ফিরে আসার পরও যদি রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে রাখতেন নীরজাকে, সেক্ষেত্রে আদিত্যের যৌনবাসনা পূরণে সামাজিক অন্তরায় থেকেই যেত। এজন্য রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই নীরজার মৃত্যুকে যথাসম্ভব যৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সমাজ-জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে উপন্যাসে যেসব নারী-চরিত্র তুলে এনেছেন, তারা পুরুষতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-নারীর ন্যায় নিজেদেরকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুগামী কল্যাণীয়া নারী হিসেবেই গড়ে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসে নারী-চরিত্র নির্মাণের সময় পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষে ছিলেন। বাঙালি নারীসমাজের প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সমালোচনার স্বার্থেই তিনি বিনোদিনীর [চোখের বালি] ঔদ্ধত্যকে সন্ন্যাসের মহানব্রতে উৎসর্গ করেছেন।[৪৪] বিমলাকে [ঘরে-বাইরে] ফিরিয়ে দিয়েছেন নিখিলেশের সাংসারে অর্থাৎ তাকে স্বামীর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে হয়েছে। গোরার আদর্শে নিজেকে অলংকৃত করে সার্থক হয়েছে সুচরিতার [গোরা] নারী-জীবন। সর্বোপরি রবীন্দ্র-রোমান্টিকতার সৃষ্টি লাবণ্যকে [শেষের কবিতা] বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন অমিতের প্রণয়ের বিশাল জগৎ থেকে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন, পরিণামে লাবণ্য সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে আবদ্ধ হোক এবং গৃহলক্ষ্মী মাতৃমূর্তি হয়ে গার্হস্থ্যজীবনে নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাটিয়ে দিক।

১০.
এলালতার সাংসারিক সীমাবদ্ধতা

রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* এক অর্থে শেষ উপন্যাস হলেও *চার অধ্যায়* [১৯৩৪] রচনার মধ্য দিয়ে তিনি আক্ষরিক অর্থে শেষ উপন্যাস রচনা করেন। এ উপন্যাসের মূল ঘটনাস্রোতে দেশপ্রেম এবং বিপ্লববাদী চেতনা ব্যবহার করে তিনি যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন পরিণামে সেখানে প্রণয় মুখ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী-চরিত্র এলালতা

এবং বিপ্লবী অতীন। এ দুজন নর-নারীর মানসিক সম্পর্কের সেতু হিসেবে প্রণয়কে মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করেও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাদের পরিণতি দান করেছেন ট্র্যাজিডিতে। এলা চরিত্র নিয়ে বিশেষ আলোচনার সুযোগ না থাকলেও উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথকে চরিত্রটিকে সংসারমুখিই করে তুলতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত। অতীন যতোবার তার পথের সাথে এলার পথের পার্থক্য-দূরত্ব তৈরি করতে চেয়েছে এলা ততোই তাকে সংসারের পথে আদর্শ বাঙালি নারীর ন্যায় অথবা বলা যায়, গার্হস্থ্যলক্ষ্মী হিসেবে টেনে ধরেছে, আকর্ষণ করেছে। যদিও *চার অধ্যায়* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে নারীর বিরোধিতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিজয়গাথা রচনা করেননি তথাপি নারীকে তিনি সংসারেই আবদ্ধ রেখেছেন। অবশ্য বিষয়গত কারণেও এ উপন্যাসে নারী-চরিত্রের বিরুদ্ধে বিশেষ বিরোধিতার সুযোগ ছিল না রবীন্দ্রনাথের। এ উপন্যাসের ঘটনায় দেশপ্রেম এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অনুষঙ্গ প্রধান লক্ষ্য থাকায় সেইভাবে ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্লোকের কথা উঠে আসে নি। বরং এখানে মনস্তাত্ত্বিক যে প্রভাবটুকু পড়েছে তা ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তে সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিষয়কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

শেষকথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রায় সব নারীই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার; ফলে তারা অনিবার্যভাবেই বাঙালি সমাজের প্রথাগত ও চিরায়ত আদর্শের অনুগামী সাধারণ নারী। একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রোপন্যাসের কোনো কোনো নারী-চরিত্রের জীবনঘটনায় রবীন্দ্রনাথ এমন অনুষঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, যা উপরিস্তরের পর্যালোচনায় মনে হয়, তারা বিদ্রোহী, প্রতিবাদী কিংবা স্বাধীন; কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণের আত্মমুকুরে অন্তর্গত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এরা [নারী-চরিত্র] চিরায়ত পুরুষবাদী সমাজের অধীনস্ত এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাপুষ্ট অধঃস্তন আদর্শ বাঙালি নারী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তাঁর উপন্যাসে নারীদের প্রচলিত পুরুষবাদী সমাজের চাওয়া-পাওয়া এবং ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করেছেন। অথবা বলা যায়, তিনি সচেতন সত্তায় দেখিয়েছেন পুরুষবাদী সমাজের অধীনে নারী-জীবন অধঃস্তন। তাঁর উপন্যাসে প্রথানুগ সমাজের চির-বঞ্চিত ও হতভাগ্য নারীদের চিত্রই পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও জীবনের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ নারীসমাজের স্বাধীনতা কিংবা তাদের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে প্রতিবাদের সময় কখনোই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না; তিনি নম্র ও বিনয়াবনত কণ্ঠেই সাহিত্যে তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যে বিদ্রোহী নারীসত্তা [বিশেষত মৃণাল ও চন্দরা] আবিষ্কৃত হয়, সেই ধরনের আর একটি চরিত্রও তাঁর কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় না। বরং উপন্যাসের নারীদের কেউ কেউ দু-একবার সবলার ন্যায় আচরণ করলেও পরিণামে তারা প্রথাগত বাঙালি সমাজের দুর্বলা নারীর কোমলতায় ও আনুগত্য স্বভাবে আত্মসমর্পিত। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই নির্মাণ করেছেন নারীর নিয়তি-নির্দিষ্ট জীবন। তবে তিনি নারীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু আধটু স্বাধীনতার কথা বলেছেন দুএকটি উপন্যাসে, স্বভাবজাত নিচুকণ্ঠে। তাঁর উপন্যাসের কোনো নারী-চরিত্রই পুরুষবাদী সমাজের শেকল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার কিংবা আধুনিক ইউরোপীয় চেতনাজাত প্রগতিশীল মানবিক

স্বাধীনতা লাভ করেনি; মূলত রবীন্দ্রনাথ দিতে চাননি নারীকে সেই স্বাধীনতা। ফলে তাঁর উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলোর সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, রবীন্দ্রোপন্যাসের নারীরা, প্রথাগত বাঙালি পুরুষশাসিত সমাজের অধীনস্ত সত্তা মাত্র। ন্যূনতম যতটুকু স্বাধীনতা না দিলে পুরুষতন্ত্র টিকে না থাকার আশংকা থাকে, রবীন্দ্রনাথ নারীর ক্ষেত্রে ততোটুকু স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন। সার্বিকভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চিত্রিত নারীসমাজের জীবন প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীন এবং অধঃস্তন; তারা পুরুষের বশ্যতা নির্ধারিত নিয়তি হিসেবে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েই গার্হস্থ্য জীবনের কল্যাণীয়া গৃহলক্ষ্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নারীকে গৃহী এবং প্রথাগত সাংসারিক বৃত্তেই করেছেন সীমাবদ্ধ; সংসারের বাইরে, সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতি, আচার-সংস্কার-বিশ্বাস অথবা রীতি-নীতির বিরোধিতাও করতে দেননি। এজন্যই বিনোদিনী কিংবা দামিনীর মতো প্রচণ্ড জীবনপিয়াসী নারীদের তিনি পরিণামে ধর্মে-কর্মে লিপ্ত করে পাপ মোচন ও পারলৌকিক মুক্তির একমাত্র লক্ষ্যে নিয়োজিত করেছেন। আধুনিক নারীবাদীরা মানুষ হিসেবে নারীর যে স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদার কথা বলেছেন, তা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি; তিনি নারীর প্রকৃতিগত দৈহিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করে নারীকে প্রতিষ্ঠা করেছেন গৃহলক্ষ্মী-কল্যাণীয়া রূপে।

তথ্যসূচি:

---

১ [প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে জীবন ধারণ করতে চায়, জীবনে কিছু হতে চায় এবং সেভাবেই জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সে অন্তিমকাল পর্যন্ত করতে থাকে। তার একটা নিজস্ব চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতির জগৎ আছে। কাজেই সে এখনও যা নয়, অর্থাৎ হয়ে উঠতে পারেনি, স্ব-নির্ধারিত পথে তা হবার প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার 'অস্তিত্ব'-এর সার্থকতা। 'অস্তিত্ব' অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে তখনই, যখন ব্যক্তিবিশেষ তার অতীত কর্ম-জীবনের কথা মনে রেখে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পর্দায় তার নিজের আঁকা ভাবমূর্তিটির বাস্তব রূপায়ণের কাজে ব্যস্ত থাকে। একেই বলে 'আত্ম-অতিক্রমণ'। আত্ম-অতিক্রমণ ভিন্ন 'অস্তিত্ব' অসম্ভব। সুতরাং মানুষ একটি নিছক প্রদত্ত জীব নয়, জীবন সে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টামাত্র নয়, রূপায়ণের জীবন-প্রতিমাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি, এ-জগৎ যে তার 'অস্তিত্ব'-এর মূল ভিত্তি, এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের একমাত্র ক্ষেত্র, সে বিষয়েও সে সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই কেবলমাত্র আত্ম-সচেতন হলেই অস্তিত্বশীল হওয়া যায় না, চেতন বহির্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কেও সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।]—শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১ম প্র, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাহিত্য পরিষদ; পৃ. ৯

২ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রকাশের কালানুক্রম মেনে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি উপন্যাসের নারী-চরিত্র নিয়ে পৃথক মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রতিতুলনা করা হয়েছে।

৩ কোনো কোনো রবীন্দ্র-গবেষক অবশ্য 'করুণা' শীর্ষক অসমাপ্ত রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম উপন্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪ প্রসঙ্গত এখানে বলা দরকার যে, *চোখের বালি*'র মতো সার্থক উপন্যাস রচনার তিন বছর পর ১৯০৬

সালে রবীন্দ্রনাথ *নৌকাডুবি* রচনা করলেও সেই অর্থে উপন্যাসটি *চোখের বালি*'র সমকক্ষ তো নয়ই বরং সফল উপন্যাস হিসেবেও গণ্য করা যায় না।

৫ [তখনকার বাঙালী পাঠক *নৌকাডুবি* পড়িয়া কি মনে করিয়াছিল, জানি না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমরা একটু বিস্মিত হই এই ভাবিয়া যে, *চোখের বালি* রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে দুই বৎসর পর *নৌকাডুবি*'র মত রোম্যান্টিক ঘটনা-নির্ভর উপন্যাস কি করিয়া নিঃসৃত হইল। আর্ট এবং মননশীলতা এই উভয় দিক হইতেই *নৌকাডুবি চোখের বালি* অপেক্ষা অপরিণত, অথচ কালগণনার দিক হইতে *নৌকাডুবি চোখের বালি*'র পরের রচনা।"]–নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, ৫ম সং [পরিশোধিত], কলিকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., ১৩৬৯; পৃ. ৪০৪

৬ *বৌঠাকুরাণীর হাট*, ও *রাজর্ষি* উপন্যাসদ্বয় মূলত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ফলে এখানে সেই অর্থে সমকালীন সমাজ-জীবনে নারীর বাস্তবতার প্রফিলন ঘটে নি। এজন্য আমাদের এ আলোচনা থেকে এ উপন্যাস দুটোর নারী-চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমাজ' [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র], রবীন্দ্র-রচনাবলী [৬ষ্ঠ খণ্ড], ২য় মু, ঐতিহ্য সং, ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৪; পৃ. ৭০৬

৮ দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭০৬

৯ তদেব, পৃ. ৭০৭-৭০৮

১০ তদেব, পৃ. ৭০৭-৭০৯

১১ [যেমন আছ তেমনি থাকো। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক, সত্য, সরলতা শ্রী যদি মূর্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে সে গৃহে বিশৃঙ্খলতা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই এই জন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলতা; বড়ো বাড়াবাড়ি– তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।]–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পঞ্চভূত' [নরনারী], রবীন্দ্র-রচনাবলী [১ম খণ্ড], পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৩১

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমায়িক সারসংগ্রহ' [স্ত্রী-মজুর], রবীন্দ্র-রচনাবলী [১৭শ খণ্ড], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩৭

১৩ [বিধবাবিবাহবিরোধী মহর্ষি নিজের নাত বৌ ১৫ বছর বয়সেই বিধবা সুশীলার পিতামাতা কর্তৃক গৃহীত তাঁদের কন্যাটির সদ্যপ্রবর্তিত (১৮৫৬) আইনসম্মত বিধবাবিবাহের উদ্যোগ বাঞ্ছাল করে দেন এবং তাতে মুখ্য ভূমিকাটি পালন করেন তাঁর সকল আপত্তিকর কর্মের সমর্থক ও সংঘটক পুত্র রবীন্দ্রনাথ– যখন অন্য পুত্রগণ আদর্শগত অসমর্থনহেতু অপারগতা প্রকাশ করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী তো ব্রহ্মচারিণী কিংবা কামগন্ধহীনা যন্ত্রমাত্র নন। তবু বিধবাবিবাহের প্রশ্নে *চোখের বালি* (১৯০২) থেকে *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) পর্যন্ত উপন্যাসগুলোর লেখকের কাছে মানুষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে জীবনবিমুখ তত্ত্ব।]– আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অধ্যায়*, আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কালি ও কলম*, ১০ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা [প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা], ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০১৩; পৃ. ১৭-১৮

১৪ দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ৭ম সং, পুনর্মু, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯; পৃ. ৮২

১৫ নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত; পৃ. ৪০৩

১৬ সৈয়দ আকরম হোসেন 'বরীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ', পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮; পৃ. ১৬৫

১৭ [কাশীবাসী তীর্থ যাত্রী হিসেবে বিনোদিনীর ধর্মকর্ম ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না]

১৮ সৈয়দ আকরম হোসেন *বরীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭১

১৯ নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত; পৃ. ৪০৩

২০ সৈয়দ আকরম হোসেন *বরীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৫

২১ আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অঞ্চল*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮

২২ দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৬

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭০৬

২৪ [কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম। ছোট বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার পক্ষে পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম, সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল।]–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭০৮

২৫ দ্র. তদেব, পৃ. ৭০৭-৭০৯

২৬ তদেব, পৃ. ৭০৮

২৭ [বলেন্দ্রনাথের বিধবা সুশীতলা বা সাহানা দেবীর পিত্রালয় থেকে বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, এই সংবাদ পেয়ে বিধবাবিবাহের বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ পারিবারিক সম্মান (!) রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে পুত্র রবীন্দ্রনাথকে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলেন বিয়ের চেষ্টা বাঞ্চাল করে তাঁকে পিতৃগৃহ থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসবার জন্য। পিতার এমন বেআইনি অপকর্মটিও সুসম্পন্ন করে এলেন গুরুদেব– ব্যক্তিগত আদর্শের বিপরীত হওয়াতে যেটি করতে তার অন্য কোনো দাদা সম্মত হননি।]–আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অঞ্চল*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯

২৮ তদেব, পৃ. ৩৪

২৯ [অবশ্য পুত্র পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে প্রথম বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন নিজের পত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিধবা প্রতিমার বিয়ে দিয়ে।]– আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অঞ্চল*, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪

৩০ [একজন লেডি-ডফারিন্-স্ত্রী-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোটো কুঠরি– ছোট ছোট জানলা, বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্টস্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রের দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন– তখন সে মনে করে কী সর্বনাশ, কী ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কী স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রাস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার পাতপাখ খেয়ে রাত্রিযাপন করি।]–রবীন্দ্রনাথ, 'সমাজ' [প্রাচ্য ও প্রতীচ্য], রবীন্দ্র-রচনাবলী [৬ষ্ঠ খণ্ড], পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৫৫

৩১ তদেব

৩২ নারীর শিক্ষার কথা বললেও তিনি তা শুধু দাম্পত্যজীবনকে সুখী-সার্থক করে তোলার প্রশ্নেই গ্রহণ করেছিলেন; অন্য কোনো কারণে নয়। এর প্রমাণ তাঁর পারিবারিক জীবনেই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনা করতে গিয়ে আবদুশ শাকুর জানিয়েছেন : [...] পুনর্বিবাহবঞ্চিতা বলেন্দ্রনাথ-পত্নী সাহানা ঠাকুরের শিক্ষায়ও বাদ সেধেছেন চাচাশ্বশুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পড়াশোনার জন্য বালবিধবাটিকে প্রফুল্লময়ী-নাম্নী চিরদুঃখময়ী শাশুড়ি শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চাইলে, তাতে তাঁর বিখ্যাত দেবরের আকুকুল্য জোটেনি। 'উদার ও মহান শিক্ষাবিদরূপে পরিচিত' রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবহারকে করুণাময় মুখোপাধ্যায় বিস্ময়ের ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন।]–আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অঞ্চল*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮

৩৩ রবীন্দ্রনাথ, *সাময়িক সারসংগ্রহ* [ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়], রবীন্দ্র-রচনাবলী [১৭শ খণ্ড], পূর্বোক্ত; পৃ.৭৩৩

৩৪ সন্দীপ চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী শঠ প্রতারক ও ভণ্ড দেশপ্রেমিকের মুখোশ পরিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

৩৫ সন্দীপের নারী-সমাজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা প্রকারন্তরে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি নিজে নারী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করেন না তা 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' পত্রে ব্যক্ত করেছেন। এজন্যই আধুনিক নারী-সমাজ স্বাধীনতার নামে এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে, তা প্রমাণ করেছেন সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আবদুশ শাকুর লিখেছেন : [১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ বালবিধবা সাহানার পুনর্বিবাহের আয়োজন ভণ্ডুল করে তাকে এলাহাবাদের পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসে কলকাতা হয়ে শিলাইদহে রেখে আসেন। এরপরও সাহানা মাঝে মাঝে এলাহাবাদের মায়ের কাছে গেছেন। এলাহাবাদে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে দেখা যায় (২৫ জুন ১৯০৭), 'আমাদের বিদ্যালয়ে সায়েন্স পড়াইবার সুবিধা বটে কিন্তু বিদ্যালয়ের লেবরেটরিতে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সামনে তোমাকে বাহির হইতে হইবে– সে কি সম্ভব হইবে?'

'ঠাকুরবাড়ির বউ ও মেয়েরা উনিশ শতকেই পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, অভিনয় করেছিলেন, সরলা দেবী চাকরিও করেছিলেন। উনিশশো সাতে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পাঠককে বিস্মিত করে।' (উদ্ধৃত: বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, মে ২০০১, কলকাতা)]–আবদুশ শাকুর, *রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অধ্যায়*, পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩

৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩৩

৩৭ তদেব

৩৮ দ্র. তদেব

৩৯ রবীন্দ্রনাথ হয়তো পুরুষতন্ত্রের চূড়ান্ত নৃশংসতা দেখাতে চেয়েছেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর মানসচেতনার দ্বিবাচনিক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম প্রতিবেদন হিসেবে পুরুষতন্ত্রের নৃশংসতা এবং ভয়বহতার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় প্রতিবেদন তৈরি করা হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কুমুর সবকিছু মেনে নেয়ার মানসিকতায় সুপ্ত রয়েছে নারী-সমাজের আত্মরক্ষার ব্যর্থতা।

৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র], পূর্বোক্ত; পৃ. ৭০৮

৪১ তদেব, পৃ. ৭০৭

৪২ প্রথম ভারতীয় নারী রমাবাইয় এক বক্তৃতায় নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে পুরুষের সমান অধিকারের কথা বললে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা করে একটি পত্র লেখেন।-দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে/ পত্র]

৪৩ রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' রচনার আগেই পরকীয় প্রণয়ের কথা জানিয়েছেন *ঘরে-বাইরে*, *চতুরঙ্গ* প্রভৃতি উপন্যাসে।

৪৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে রোহিণীর যৌন-স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেননি, অনুরূপ রবীন্দ্রনাথও পারেননি বিনোদিনীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও যৌন-স্বাধীনতাকে। ফলে তিনি বিনোদিনীকে পরিণামে কাশীতে পাঠিয়ে পক্ষান্তরে সমাজবাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রতিপাদ্য: [রবীন্দ্রনাথের কালে রোহিণী বিনোদিনীতে বিবর্তন লাভ করিয়াছে; নারীর যৌন-স্বাধীনতাবোধের রূপ প্রচলিত সংস্কারকে আহত করা সত্ত্বেও আমাদের বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে।]–নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত; পৃ. ৪০৪